প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্র/এ.
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা -১২০৭।
Web:www.archaeology.gov.bd
E-mail : director_general@archaeology.gov.bd

প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও অনুসন্ধান প্রতিবেদন

(২০১৯-২০২১)

কক্সবাজার জেলা

(সদর, রামু, উখিয়া, মহেশখালী, টেকনাফ ও চকরিয়া উপজেলা)

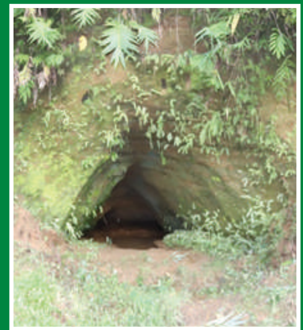

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়
চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ, কুমিল্লা

গোপালগঞ্জ জেলার
প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ প্রতিবেদন
২০১৭-২০১৯

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গোপালগঞ্জ জেলার প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ প্রতিবেদন
২০১৭-২০১৯

প্রতিবেদক

মোঃ মাহাবুব-উল আলম
তানিয়া সুলতানা
সাবিনা ইয়াসমিন

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গোপালগঞ্জ জেলার প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ প্রতিবেদন
২০১৭-২০১৯

জরিপ দলের সদসবৃন্দ

উপদেষ্টা
মোঃ আমিরুজ্জামান

সার্বিক তত্ত্বাবধান
রাখী রায়

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
মোঃ মাহাবুব-উল আলম

সদস্য
তানিয়া সুলতানা

সদস্য
সাবিনা ইয়াসমিন

নকশা অঙ্কন
তৃপ্তি রাণী হালদার

ক্যাম্প সুপারভাইজার
মোঃ মিজানুর রহমান

আলোকচিত্র ধারণ
মোঃ মোজাহার হোসেন

মুদ্রণ সহযোগিতায়
ড. মোঃ আতাউর রহমান
মোঃ মহিদুল ইসলাম
লিলি আরা চৌধুরী
এম. এ. হামিদ খান

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর-২০২১

প্রকাশক
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্র/এ
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
Web: www.archaeology.gov.bd
Email: director_general@archaeology.gov.bd

গ্রন্থস্বত্ব
প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

মূল্য: ৪০০ টাকা

মুদ্রণ সংখ্যা: ৫০০ কপি

ISBN: 978-984-35-2461-4

প্রতিবেদক
মোঃ মাহাবুব-উল আলম
তানিয়া সুলতানা
সাবিনা ইয়াসমিন

সম্পাদনা বোর্ড
রতন চন্দ্র পণ্ডিত
মোঃ আতাউর রহমান
অধ্যাপক ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ
অধ্যাপক স্থপতি ড. আবু সাঈদ এম আহমেদ
অধ্যাপক মালিহা নার্গিস আহমেদ
মোঃ আমিরুজ্জামান
ড. মোঃ আতাউর রহমান

প্রাক-কথন

প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্যকে পদ্ধতিগত অনুসন্ধান, শনাক্তকরণ এবং নথিভুক্তকরণ প্রক্রিয়াটি প্রত্নচর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। পদ্ধতিগত জরিপ, অনুসন্ধান, শনাক্তকরণ এবং নথিভুক্তকরণের পর কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ ও জনসম্মুখে উপস্থাপন করে জ্ঞানভিত্তিক প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য চর্চার ক্ষেত্রটিকে অবারিত রাখা সম্ভব। প্রত্নস্থল তথা স্থাবর প্রত্নসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার প্রথম ধাপ হলো জরিপের মাধ্যমে পুরাকীর্তি শনাক্তকরণ ও নথিভুক্তকরণ। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় পুরাকীর্তি শনাক্তকরণ ও নথিভুক্তকরণের ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে স্থানিক প্রেক্ষিত সম্বন্ধে মুখ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অনুসন্ধান ও জরিপ কাজের মাধ্যমে পুরাকীর্তি শনাক্তকরণ এবং নথিভুক্তকরণ শেষে সংশিষ্ট অঞ্চলের প্রত্নতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন করা সম্ভব হয়। প্রত্নস্থল অনুসন্ধান ও জরিপের মাধ্যমে কোনো অঞ্চলের বসতি বিন্যাস, ভূ-রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক অবস্থা, বাস্তুসংস্থানিক প্রেক্ষাপট এবং অভিযোজন সম্বন্ধে জানা যায়। সাধারণত প্রত্নস্থল শনাক্তকরণের জন্য প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর জরিপ ও অনুসন্ধান এবং উৎখনন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন এ অধিদপ্তর প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান, উৎখনন, সংরক্ষণ, গবেষণা ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংবলিত জাদুঘর পরিচালনা সংক্রান্ত দায়-দায়িত্ব আইন দ্বারা বিধিবদ্ধ। এসকল উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে গোপালগঞ্জ জেলায় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ কাজ পরিচালনা করে এবং জরিপ কাজের প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। উল্লিখিত সময়ে জরিপ কার্য সম্পাদিত ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হলেও ইতোপূর্বে প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয় নাই। এক্ষণে ইতোপূর্বে প্রণীত 'গোপালগঞ্জ জেলার প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ প্রতিবেদনটি' ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

জরিপ কাজ সম্পাদন, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও মুদ্রণের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

রতন চন্দ্র পণ্ডিত
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর

মুখবন্ধ

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পৈত্রিক নিবাস ও স্মৃতিবিজড়িত গোপালগঞ্জ জেলায় পরিচালিত প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ প্রতিবেদন প্রকাশ ঢাকা আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয় তথা প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের জন্য একটি গৌরবময় কর্মপ্রয়াস। প্রত্নতত্ত্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও অনুসন্ধান। ইতিহাসের বস্তুগত উৎস ও উপাদান অনুসন্ধানে প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপের ভূমিকা অপরিসীম। কোনো জাতির প্রাচীন ঐতিহ্য ও ইতিহাসের উৎস হিসেবে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ খুঁজে বের করে সেগুলো শনাক্তকরণ ও নথিভুক্তকরণের মাধ্যমে সে জাতিকে স্বীয় প্রাচীন ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে জাগ্রত করে তুলতে প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ একটি অত্যাবশ্যকীয় কর্ম। জরিপের মাধ্যমে একটি অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহের প্রকৃত চিত্র ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। এসকল দিক বিবেচনা করেই প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের ঢাকা আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয় কর্তৃক গোপালগঞ্জ জেলায় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ পরিচালিত হয়েছে এবং এর প্রতিবেদন সংকলিত হয়েছে। একটি দেশ ও জাতির প্রাচীন ইতিহাস-ঐতিহ্য কতটুকু গৌরবময় ও সমৃদ্ধ ছিল তা জানতে এ ধরনের প্রতিবেদন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আর এ লক্ষ্যেই আলোচ্য প্রতিবেদনটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এ প্রতিবেদনে টুঙ্গিপাড়ায় অবস্থিত জাতির পিতা ও তাঁর পূর্বপুরুষগণের আবাসস্থলসহ গোপালগঞ্জ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে বর্তমানে টিকে থাকা অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন স্থান পেয়েছে। এসকল প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন একশ বছরের পুরানো এবং ঐতিহাসিকভাবে এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া এখানে কিছু অস্থাবর পুরাবস্তুও (Movable Antiquities) পাওয়া গেছে। জরিপ দলের সদস্যগণ বিভিন্ন এলাকায় গমন করেন এবং সরেজমিনে তথ্য সংগ্রহ করেন। এক্ষেত্রে তারা স্থানীয় প্রশাসন, জনসাধারণ, বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থ, শিলালিপি থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন। প্রত্ননিদর্শনের ভৌগোলিক অবস্থান, ইতিহাস, সময়কাল, স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য, লোকগাথা, কিংবদন্তী প্রভৃতি বিষয় প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবেদনটিতে মসজিদ, মন্দির, মঠ, পুরাতন ভবন, প্রাচীন দিঘি ও পুকুর প্রভৃতি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের উল্লেখ রয়েছে। যেগুলো কালের করালগ্রাস এড়িয়ে ইতিহাস-ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হিসেবে এখনও টিকে আছে। এছাড়া প্রতিবেদনটিতে বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে কোটালীপাড়াস্থ প্রাচীন চন্দ্র বর্মণ কোর্ট দুর্গের অনুসন্ধানে প্রাপ্ত নিদর্শনাবলি।

জরিপ কাজ পরিচালনা ও জরিপ প্রতিবেদন প্রকাশের পেছনে রয়েছে অধিদপ্তরের ভিতর ও বাহিরের বহু ব্যক্তির অক্লান্ত পরিশ্রম ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান। যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্যই এই জরিপ প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। এক্ষেত্রে এ জরিপ প্রতিবেদনটি প্রকাশের নির্দেশনা প্রদানের জন্য প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব রতন চন্দ্র পণ্ডিত মহোদয়ের প্রতি। মাঠ পর্যায়ে অনুসন্ধান কাজে জরিপ অঞ্চলের যেসকল নাম না জানা ব্যক্তি তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে বা অন্যভাবে জরিপ দলকে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আঞ্চলিক কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ মাহাবুব-উল আলমের প্রতি, যিনি জরিপের মাঠ পর্যায়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে অক্লান্ত পরিশ্রম ও মেধা ব্যয় করেছেন এবং প্রতিবেদনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছেন। এছাড়াও সাবিনা ইয়াসমিন, তৃপ্তি রাণী হালদার, মোঃ মোজাহার হোসেন ও মোঃ মিজানুর রহমানকে মাঠ পর্যায়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি জনাব ড. মোঃ আমিরুজ্জামানের (উপ-পরিচালক, প্রত্ন:) প্রতি, যিনি জরিপ দলের উপদেষ্টা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন এবং আরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের প্রকাশনা শাখার প্রতি প্রতিবেদনটি প্রকাশনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য।

প্রতিবেদনটি প্রকাশের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হলেও কিছু অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা থেকে যেতে পারে। এক্ষেত্রে পাঠকের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি কামনা করছি। প্রতিবেদনটি প্রকাশনার লক্ষ্য সফল হলে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর দেশের ঐতিহ্য অনুসন্ধান কর্মে আরও উৎসাহ পাবে এবং এ কর্মে নিয়োজিত কর্মীগণ নিজেদের ঋদ্ধ মনে করবে। সবার প্রতি রইল শুভেচ্ছা ও শুভকামনা।

রাখী রায়
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
আঞ্চলিক পরিচালক, ঢাকা বিভাগ

সূচিপত্র

১.০	ভূমিকা	৯
১.১	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৯
১.২	জরিপ ও অনুসন্ধান পদ্ধতি	৯
১.৩	জরিপ ও অনুসন্ধান	৯
২.০	গোপালগঞ্জ জেলা	৯
২.১	জনবসতি	১১
৩.০	কোটালীপাড়া উপজেলা	১২
৩.১	কোটালীপাড়া পৌরসভা (ঘাঘর ইউনিয়ন)	১২
৩.১.১	কোটালীপাড়া দুর্গ	১৩
৩.১.২	মুখ্য কোটালীপাড়া মঠ	১৫
৩.১.৩	বিমল কর্মকারের বাড়ি	১৬
৩.১.৪	হারুন প্রফেসরের ভিটা	১৬
৩.১.৫	হরলাল কর্মকারের ভিটা	১৭
৩.১.৬	প্রল্লাদ কর্মকারের ভিটা	১৯
৩.১.৭	ওযুর ভিটা	১৯
৩.১.৮	রমনী কর্মকারের ভিটা	২০
৩.১.৯	অসীম কর্মকারের ভিটা	২০
৩.১.১০	বান্দল জোড়া সমাধি মঠ	২১
৩.১.১১	বিশারদ বাড়ি	২১
৩.১.১২	দুর্গামন্দির	২২
৩.১.১৩	মদনপাড়	২২
৩.১.১৪	মদনপাড় দিঘি	২৩
৩.১.১৫	ক্ষীতিশ চন্দ্র চৌধুরীর বাড়ি ও ভিটা	২৪
৩.১.১৬	উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসের পূর্ব পাশের পুকুর	২৪
৩.২	আমতলী ইউনিয়ন	২৬
৩.২.১	নগরবাসী সাহার বাসভবন	২৭
৩.২.২	নগরবাসী সাহা সমাধি মঠ	২৮
৩.২.৩	নগরবাসী সাহার পুকুর ও ঘাট	২৮
৩.২.৪	ছোট মঠ	২৯
৩.২.৫	মনসা মন্দির	২৯
৩.২.৬	ঘোষবাড়ি, উনশিয়া, আমতলী	২৯
৩.২.৭	ভট্টের বাগান শ্রী শ্রী নিশনাথ খোলা সার্বজনীন কালীমন্দির	৩০
৩.২.৮	রায়চরণ সাহার বাড়ি (পুরাতন ইউনিয়ন ভূমি অফিস)	৩০
৩.২.৯	লক্ষ্মীকান্ত মণ্ডলের ভিটা (১) পরীক্ষামূলক প্রত্নতাত্ত্বিক খনন	৩১
৩.২.১০	মিশ্রবাড়ি মনসা মন্দির	৩৩
৩.২.১১	লক্ষ্মীকান্ত মণ্ডলের ভিটা (২)	৩৪
৩.২.১২	মিখাইল অধিকারীর ভিটা	৩৪
৩.২.১৩	কৈলাশ কর্মকারের বাড়ি	৩৪
৩.২.১৪	গৌরমণি দেবীর সমাধি মঠ	৩৪
৩.২.১৫	কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যর পৈত্রিক ভিটা	৩৫
৩.২.১৬	কালীমোহন সিকদারের দিঘি	৩৬
৩.২.১৭	মৌলঙ্গির বিল বা ফেনার বিল	৩৬
৩.৩	বান্দাবাড়ি ইউনিয়ন	৩৭
৩.৩.১	হরিণাহাটি জমিদারবাড়ি	৩৭
৩.৩.২	বান্দাবাড়ি দিঘি	৩৯
৩.৪	রামশীল ইউনিয়ন	৩৯
৩.৪.১	ব্রজবাসী মল্লিকবাড়ি	৩৯
৩.৪.২	রূপচাঁদ মল্লিক মঠ	৪০
৩.৪.৩	কালীমন্দির	৪১
৩.৪.৪	কালিচরণ চক্রবর্তীর ভিটা ঘাট	৪১
৩.৪.৫	জহরের কান্দি মনসা মন্দির	৪১
৩.৪.৬	বিষ্ণু মূর্তি	৪২
৩.৪.৭	নরসিংহ মূর্তি	৪২
৩.৪.৮	হরিমন্দির	৪৩
৩.৪.৯	জোড়া মঠ	৪৩
৩.৫	কলাবাড়ি ইউনিয়ন	৪৪
৩.৫.১	দাসবাড়ি ও মঠ	৪৪
৩.৫.২	মাঝপাড়া সমাধি মঠ	৪৫
৩.৫.৩	সোনাই বাড়ৈ এর স্মৃতি মন্দির	৪৫
৩.৫.৪	দত্তবাড়ি মঠ	৪৫
৩.৫.৫	মতিগাইনের মঠ	৪৬
৩.৬	রাধাগঞ্জ ইউনিয়ন	৪৬
৩.৬.১	নারিকেল বাড়ি মঠ	৪৭
৩.৬.২	সাহা বাড়ি	৪৭
৩.৬.৩	সাধ্বী তেরেজা ক্যাথলিক মিশন	৪৮
৩.৬.৪	কার্তিক জয়ধরের বাড়ি	৪৮
৩.৬.৫	ভাবুকবাড়ি জোড়া মঠ ও পুকুর	৪৯
৩.৬.৬	নিরুপম ওঝার মঠ	৪৯
৩.৬.৭	রাজেন্দ্রপাড় দিঘি	৫০
৩.৬.৮	রাজেন্দ্রপাড় দিঘি মঠ	৫০
৩.৬.৯	রাজেন্দ্রপাড় দুর্গা মন্দির	৫০
৩.৭.	সাদুল্লাপুর ইউনিয়ন	৫১
৩.৭.১	ভূতের বাড়ি দিঘি	৫১
৩.৭.২	মনসা মন্দির	৫১
৩.৭.৩	ধুলীর মঠ	৫২
৩.৮	কুশলা ইউনিয়ন	৫২
৩.৮.১	সাহাপাড়া জোড়া মঠ	৫২
৩.৮.২	পঞ্চরত্ন মঠ	৫৩
৩.৯.	হিরণ ইউনিয়ন	৫৩
৩.৯.১	পোদ্দার বাড়ি	৫৪

সূচিপত্র

৩.৯.২ হিরণ বাজার চিতা মঠ ৫৪
৩.১০ পিঞ্জুরী ইউনিয়ন ৫৫
৩.১০.১ ড. ধীরেন সেনের বাড়ি (নির্মল সেনের কাকা) ৫৫
৩.১০.২ সোনাকান্দুরি ৫৫
৩.১০.৩ শ্রীরামপুর দিঘি ৫৬
৩.১০.৪ পূণ্যবতী মসজিদ ৫৬
৩.১১ কান্দি ইউনিয়ন ৫৬
৩.১১.১ নিশিকান্ত রাঢ়ীর মঠ ৫৭
৩.১১.২ যজ্ঞেশ্বর রাঢ়ীর সমাধি মঠ ৫৭
৩.১১.৩ পূর্ব কান্দি গণেশ পাগল সেবা আশ্রম ৫৮
৩.১১.৪ যাদবচন্দ্র অধিকারীর মঠ ৫৮
৩.১১.৫ গোবিন্দ মঠ ৫৮
৩.১১.৬ দধিরাম অধিকারীর মঠ ৫৮
৩.১১.৭ মুকুন্দ অধিকারীর মঠ ৫৯
৩.১১.৮ মনীন্দ্র অধিকারীর মঠ ৫৯
৩.১১.৯ রামঠাকুরের হরিমন্দির ৫৯
৪. টুঙ্গিপাড়া উপজেলা ৫৯
৪.১ টুঙ্গিপাড়া পৌরসভা ও পাটগাতি ইউনিয়ন ৬০
৪.১.১ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পূর্বপুরুষদের আবাসস্থল ৬০
৪.১.২ মণ্ডলবাড়ি ৬১
৪.১.৩ শ্রী শ্রী তপসী রাসবালা সেবাশ্রম (হরি মন্দির) ৬২
৪.২ গোপালপুর ইউনিয়ন ৬২
৪.২.১ খোকন বিশ্বাসের বাড়ি ৬৩
৪.২.২ কেশব বালার বাড়ি ৬৩
৪.২.৩ দীননাথ বালার মঠ ৬৪
৪.২.৪ গোপালপুর পুকুর/দিঘি ৬৪
৪.২.৫ ফটিক বাবুর বাড়ি ৬৪
৪.৩ বর্নি ইউনিয়ন ৬৪
৪.৩.১ অবণী ডাক্তারের বসতবাড়ি ও মনসা মন্দির ৬৫
৪.৩.২ রাজকুমারের বাড়ি ৬৫
৪.৩.৩ রাজকুমারের মায়ের মঠ ৬৬
৫ গোপালগঞ্জ সদর ৭১
৫.১ উলপুর জমিদারবাড়ি ৭১
৫.১.১ উলপুর পূর্ণচন্দ্র বিদ্যালয় ৭২
৫.১.২ নীলকান্ত স্মৃতি মঠ ৭৩
৫.১.৩ রায় স্মৃতি মন্দির ৭৩
৫.১.৪ বাগানবাড়ি উলপুর, গোপালগঞ্জ সদর ৭৪
৫.১.৫ সুধীঘোষ বাড়ি, উলপুর মধ্যপাড়া, গোপালগঞ্জ ৭৬
৫.২ খাগাইল ইউনিয়ন ৮৩
৫.২.১ গায়েবী মসজিদ খাগাইল মধ্যপাড়া ৮৩
৫.২.২ কাশিবাবুর বাড়ি ৮৩
৫.৩ হরিদাসপুর ইউনিয়ন ৮৪
৫.৩.১ মুন্সীবাড়ি (ইসমাইল মুন্সীর বাড়ি) ৮৪
৫.৩.২ শিব মন্দির ঠাকুর বাড়ি ৮৪
৫.৪ সুকতাইল ইউনিয়ন ৮৪
৫.৪.১ পূর্ণ সাহার বাড়ি ও কালীমন্দির, সুকতাইল ৮৪
৫.৪.২ কালীমন্দির ৮৫
৫.৪.৩ মঠবাড়ি মঠ ৮৫
৫.৫ গোপীনাথপুর ইউনিয়ন ৮৬
৫.৬ পাইককান্দি ইউনিয়ন ৮৬
৫.৭ সাতপাড় ইউনিয়ন ৮৭
৫.৭.১ গয়ালী চন্দ্র বিশ্বাসের বাড়ি ও মঠ ৮৭
৫.৭.২ হরিবর বিশ্বাসের বাড়ি ৮৮
৫.৭.৩ ইতিন বিশ্বাসে বাড়ি ৮৮
৫.৮ বৌতলী ইউনিয়ন ৮৮
৫.৯ করপাড়া ইউনিয়ন ৮৯
৫.৯.১ সুধীর বাড়ৈ এর বাড়ি ৮৯
৫.১০ রঘুনাথপুর ইউনিয়ন ৮৯
৫.১০.১ জোড়ামঠ, রঘুনাথপুর দক্ষিণপাড়া ৮৯
৫.১০.২ কোঠাবাড়ি মঠ, রঘুনাথপুর দক্ষিণপাড়া ৯০
৫.১১ কাজুলিয়া ইউনিয়ন ৯০
৫.১১.১ মথুরানাথ সরের বাড়ি ৯০
৬. মুকসুদপুর উপজেলা ৯১
৬.১ মুকসুদপুর পৌরসভা ৯১
৬.১.১ বাসিপালের বাড়ি ৯২
৬.১.২ শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণ পালের মঠ ৯৩
৬.১.৩ শ্রীধর কুণ্ডুর বাড়ি ৯৪
৬.১.৪ রাজেন্দ্র কুণ্ডের বাড়ি ৯৪
৬.২ বাটিকামারি ইউনিয়ন ৯৫
৬.২.১ বড় রায়বাড়ি, বাটিকামারি মধ্যপাড়া ৯৫
৬.৩ মোচনা ইউনিয়ন ১১১
৬.৩.১ জলিল শেখের বাড়ি ১১২
৬.৩.২ শিব মন্দির ১১২
৬.৩.৩ রায়চাঁদ মুখার্জির বাসভবন বা মোচনা জমিদারবাড়ি ১১২
৬.৩.৪ তারা মিয়ার বাড়ি ১১৩
৬.৩.৫ পাকদিয়া মঠ ১১৪
৬.৩.৬ খান বাড়ি মসজিদ ১১৪
৬.৪ গোহালা ইউনিয়ন ১১৫
৬.৪.১ অমৃত লাল সাহার গোলদার বাসভবন ১১৫

সূচিপত্র

৬.৪.২ গোলদার বাড়ি ১১৬
৬.৪.৩ কালীমন্দির, পঞ্চরত্ন মঠ ও ঘাট ১১৬
৬.৪.৪ মনীন্দ্র গোলদার বাড়ি ১১৭
৬.৪.৫ যাশেদার ঘাটলা ১১৭
৬.৫ রাঘদি ইউনিয়ন, মুকসুদপুর ১১৮
৬.৫.১ ফায়েক মাষ্টারের বাড়ি (মাখন ঠাকুর) ১১৮
৬.৫.২ তাঁতিহাটি কালীমন্দির ১১৮
৬.৫.৩ বিল্লু বণিকের বাড়ি (জাহাঙ্গীর শেখ) ১১৯
৬.৬ খান্দারপাড় ইউনিয়ন, মুকসুদপুর ১১৯
৬.৬.১ রাধাচরণ রায়ের স্মৃতি মঠ ১১৯
৬.৬.২ ভুবেল ডাক্তারের বাড়ি ১২০
৬.৬.৩ কবিরাজ বাড়ি ও ঘাটলা ১২০
৬.৭ গোবিন্দপুর ইউনিয়ন, মুকসুদপুর ১২১
৬.৭.১ লস্কর দিঘি ১২১
৬.৭.২ সুলতান দিঘি ১২১
৬.৭.৩ নয়া পুষ্করিণী ১২১
৬.৭.৪ কাছারি বাড়ি ১২২
৬.৮ দিগনগর ইউনিয়ন, মুকসুদপুর উপজেলা ১২৩
৬.৮.১ ভাজুন্দি ভুঁইয়াবাড়ি ১২৩
৬.৮.২ রবীন্দ্রনাথ শাহার বাড়ি ১২৩
৬.৮.৩ পঞ্চরত্ন মঠ ১২৩
৬.৮.৪ কানুরিয়া জমিদারবাড়ি ১২৪
৬.৯ মহারাজপুর ইউনিয়ন, মুকসুদপুর ১২৫
৬.৯.১ নারায়ণপুর ভুঁইয়াবাড়ি (মুন্দিবাড়ি) ১২৫
৬.৯.২ দুর্গা মন্দির ১২৬
৬.৯.৩ লক্ষ্মী নারায়ণ মন্দির ১২৭
৬.৯.৪ মুন্দিবাড়ির পুকুর ও ঘাট ১২৮
৬.৯.৫ পশ্চিম বাড়ির নদীর ঘাট ১২৮
৬.৯.৬ ভুঁইয়াবাড়ি জমিদারবাড়ি, বনগ্রাম, মহারাজপুর ১২৯
৬.৯.৭ ভুঁইয়াবাড়ি দুর্গামন্দির, বনগ্রাম, মহারাজপুর ১৩০
৬.৯.৮ ভুঁইয়াবাড়ির পঞ্চরত্ন মঠ ১৩০
৬.৯.৯ বিপিন চন্দ্র ভৌমিক জমিদার বাড়ি উত্তরে ও কুমার নদীর দক্ষিণ তীরের ঘাটলা ১৩১
৬.৯.১০ ভুঁইয়াবাড়ি অন্দর মহলের পুকুর ও ঘাটলা ১৩১
৬.৯.১১ মহারাজপুর রাজবাড়ি (মনিন্দ্র বোস) ১৩১
৬.৯.১২ উকিলবাড়ি (মৃত অশোক শাহা), বনগ্রাম, মহারাজপুর ১৩৫
৬.১০ উজানি ইউনিয়ন ১৩৬
৬.১০.১ রাজা নবীন কুমার রায়ের বাড়ি ১৩৬
৬.১০.২ বাদল কুমার রায়ের বাড়ি ১৩৭
৬.১০.৩ সালাম শেখের বাড়ি ১৩৭
৬.১০.৪ বিশ্বকর্মার মঠ ১৩৮
৬.১০.৫ সুধীর রায়ের বাড়ি ১৩৯
৬.১০.৬ শরৎকুমার রায়ের বাড়ি ১৩৯
৬.১০.৭ আনন্দ ধাম ১৩৯
৬.১০.৮ উজানি দিঘি ১৪০
৬.১০.৯ মণি মোল্লার বাড়ি ১৪০
৬.১০.১০ জগদীশ বিশ্বাসের বাড়ি ১৪০
৬.১০.১১ স্বর্গীয় অভয় নদ পাঠক মহাশয়ের সমাধি মন্দির ১৪০
৭. কাশিয়ানী উপজেলা, গোপালগঞ্জ ১৪১
৭.১ কাশিয়ানী উপজেলার মৌলিক তথ্যাবলি ১৪১
৭.২ কাশিয়ানী পৌরসভা ১৪১
৭.২.১ সখীচরণ রায়ের বাড়ি (কাশিয়ানী উপজেলা ভূমি অফিস) ১৪১
৭.২.২ হিরো মৃধার বাড়ি ১৪২
৭.২.৩ গিরিশচন্দ্র সেনের বাড়ি ১৪২
৭.৩ ফুকরা ইউনিয়ন ১৪৩
৭.৩.১ মুখার্জী বাড়ি ১৪৩
৭.৩.২ ফুকরা মঠ, কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ ১৪৩
৭.৩.৩ ফুকরা মদন মোহন একাডেমি ১৪৪
৭.৪ রাতোইল ইউনিয়ন ১৪৫
৭.৪.১ জমিদার মাখন সেনের বাড়ি ১৪৫
৭.৫ মাহমুদপুর ইউনিয়ন ১৪৫
৭.৫.১ জিকা বাড়ি মঠ ১৪৫
৭.৬ মহেশপুর ইউনিয়ন ১৪৬
৭.৬.১ নীলকুঠি ১৪৬
৭.৬.২ মল্লিক বাড়ি মঠ ১৪৬
৭.৬.৩ রায় বাড়ি মঠ ১৪৭
৭.৬.৪ গোঁসাই বাড়ি মঠ ১৪৭
৭.৭ হাতিয়ারা ইউনিয়ন, কাশিয়ানী ১৪৭
৭.৭.১ বড়বাড়ি ঘাটলা বান্ধা পুকুর ১৪৭
৭.৭.২ হাতিয়ারা মঠ ১৪৭
৭.৮ বেথুড়ি ইউনিয়ন ১৪৮
৭.৮.১ সন্তোষ বিশ্বাসের বাড়ি ১৪৮
৭.৮.২ টুনি বাড়ি ১৪৮
৭.৯ ফুকরা ইউনিয়ন ১৪৮
৭.৯.১ চন্দ্রবিলাস মুখার্জি বাড়ি ১৪৮

১.০ ভূমিকা

বাংলাদেশের হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্যময় ইতিহাস ও সংস্কৃতি তুলে ধরার জন্য প্রত্নচর্চার প্রয়োজন। প্রত্নচর্চার মাধ্যমে ইতিহাস বিনির্মাণ ও পুনর্গঠনের জন্য প্রত্নসম্পদ, প্রত্ননিদর্শন সুরক্ষা ও সংরক্ষণ প্রয়োজন। প্রত্নসম্পদ, প্রত্ননিদর্শন, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সুরক্ষায় ভবিষ্যৎ করণীয়, পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপের মাধ্যমে প্রত্নস্থান, প্রত্ননিদর্শন চিহ্নিতকরণ ও নথিভুক্তকরণ আবশ্যক।

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক বিগত শতকের আশির দশকে একটি প্রকল্পের আওতায় বেশ কয়েকটি জেলায় (বগুড়া, নওগাঁ, পাবনা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ফরিদপুর, খুলনা, মুন্সিগঞ্জ প্রভৃতি) প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও অনুসন্ধান করা হয়।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে দীর্ঘ বিরতির পর বাংলাদেশের অবশিষ্ট জেলাগুলোতে ধারাবাহিকভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে ঢাকা বিভাগীয় আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয় গোপালগঞ্জ জেলায় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও অনুসন্ধান কার্যক্রম গ্রহণ করেন।

১.১ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- ❖ গোপালগঞ্জ জেলার সকল জানা ও অজানা প্রত্ননিদর্শন, প্রত্নস্থান ও প্রত্নবস্তু জরিপ ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে নথিভুক্তকরণ।
- ❖ ইতিহাস ঐতিহ্যপূর্ণ স্থান, ভবন, ইমারত ইত্যাদি শনাক্ত ও চিহ্নিতকরণ।
- ❖ জরিপ পরবর্তী গবেষণা ও পূর্ণাঙ্গ সার্বিক জরিপ প্রতিবেদন প্রণয়ন।
- ❖ প্রত্নসম্পদ সংরক্ষণ ও রক্ষায় পরিকল্পনা গ্রহণ।

১.২ জরিপ ও অনুসন্ধান পদ্ধতি

- ❖ প্রত্ন অভিজ্ঞ ব্যক্তি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সহায়তাকারীদের সমন্বয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ দল গঠন।
- ❖ বই,পুস্তক, পত্রিকা, ইন্টারনেট ইত্যাদিতে প্রকাশিত, লিখিত উৎসাদি হতে তথ্যাদি সংগ্রহ।
- ❖ জরিপদল কর্তৃক সরেজমিনে বাস্তবভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ।
- ❖ জরিপদল কর্তৃক সরেজমিনে বাস্তবভিত্তিক অনুসন্ধান পরিচালনা।
- ❖ উপজেলা প্রশাসন, ইউনিয়ন পরিষদ ও স্থানীয় জনসাধারণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ।
- ❖ ইউনিয়নভিত্তিক গ্রাম থেকে গ্রামে, গাড়ীতে, স্থানীয় যানবাহনে হেঁটে হেঁটে তথ্যাদি সংগ্রহ।
- ❖ পরীক্ষামূলক সীমিতাকারে উৎখনন পরিচালনার মাধ্যমে প্রত্নস্থান চিহ্নিতকরণ।
- ❖ জরিপ ও অনুসন্ধান কাজে স্থানীয় ছাত্রদের অংশগ্রহনের মাধ্যমে তথ্যাদি সংগ্রহ ।

১.৩ জরিপ ও অনুসন্ধান

প্রাথমিকভাবে গোপালগঞ্জ জেলার দুটি উপজেলায় (কোটালীপাড়া ও টুঙ্গিপাড়া) ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও অনুসন্ধান কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। কাশিয়ানী উপজেলায় মোঃ মাহাবুব-উল আলম, সহকারী পরিচালক, প্রত্নতত্ত্বের মাঠ পরিচালনায় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও অনুসন্ধান করা হয়।

উপরে বর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে অনুসৃত জরিপ পদ্ধতি অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি/১৮ খ্রি. ও মার্চ/১৮ খ্রি. দু'মাস কোটালীপাড়া ও টুঙ্গিপাড়া উপজেলায় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

২.০ গোপালগঞ্জ জেলা

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের একটি জেলা গোপালগঞ্জ। গোপালগঞ্জ জেলা ঢাকা বিভাগের অন্তর্গত এবং এ জেলার আয়তন ১৪৮৯.৯২ বর্গকিলোমিটার। এ জেলার ভৌগোলিক অবস্থান ২২°০১′ থেকে ২৩°০১′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°৫০′ থেকে ৯০°০২′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। গোপালগঞ্জ জেলার উত্তরে ফরিদপুর, দক্ষিণে পিরোজপুর, বাঘেরহাট ও খুলনা, পূর্বে মাদারীপুর ও বরিশাল, পশ্চিমে নড়াইল ও মাগুরা জেলা অবস্থিত।

গোপালগঞ্জ জেলার নামকরণ নিয়ে একাধিক কিংবদন্তী আছে। ষষ্ঠ শতকে গোপচন্দ্র নামে এক রাজা এই জনপদে রাজত্ব করতেন। এই গোপচন্দ্রের নামানুসারে গোপালগঞ্জের নামকরণ হয়। এই কিংবদন্তীতে অনেকের সংশয় আছে।

অন্য আর একটি জনশ্রুতি থেকে অবগত হওয়া যায়, বহুপূর্বে এই জনপদের নাম ছিল 'রাজগঞ্জ'। এই রাজগঞ্জ ছিল প্রমত্ত মধুমতী নদীর একটি পারঘাটা। নদীটির এপার ওপারের লোকজন এই পারঘাটায় যাতায়াত করতো এবং জড়ো হতো। বিভিন্ন ধরনের দোকানপাট সৃষ্টি হতে থাকে এই পারঘাটায়। কোনো একসময় তা পরিণত হলো গঞ্জে। সে থেকে এর নাম হয় 'রাজগঞ্জ'। গোপাল নাম হতে যে গোপালগঞ্জের নামকরণ হয়েছে এই মতের সমর্থক বেশি। কিন্তু কে সেই গোপাল? মকিমপুর পরগনার জমিদারিত্বের দায়িত্বে ছিলেন রানি রাসমণি। তিনি বাস করতেন কলকাতায়। জমিদারি দেখাশোনা করার জন্য প্রায়ই তিনি এই জলময় অঞ্চলে ছুটে আসতেন। একদা তিনি তাঁর আদরের নাতি গোপালকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। গোপাল কলকাতায় শহুরে সংস্কৃতিতে বেড়ে উঠেছে। নদীবহুল ও জলময় এই পূর্ববঙ্গ সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণা ছিল না। রাজগঞ্জ পারঘাটায়

পানসি থেকে নেমে সে দেখতে পেল এক নতুন জগৎ। আনন্দে আত্মহারা হলো। যেদিকে তাকায় কেবলই জল থৈ থৈ দৃশ্য। বিলময় ফুটে আছে শাপলা, পদ্ম। সবমিলিয়ে গোপালের খুবই পছন্দ হলো এই রাজগঞ্জটি। রানি রাসমণি তাঁর সেই প্রিয় নাতির ভালোবাসার জায়গাটাকে স্মৃতির পাতায় অক্ষত রাখার জন্য রাজগঞ্জের 'রাজ'-এর পরিবর্তে 'গোপাল' শব্দটা যুক্ত করে নামকরণ করলেন 'গোপালগঞ্জ'।

অন্যমতে, ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে তুর্কি আক্রমণের প্রাক্কালে কতিপয় হিন্দু প্রাণ ভয়ে এবং ধর্মান্তরিত হওয়ার আশঙ্কায় ভারতের বিহার প্রদেশের গোপালগঞ্জ জেলা থেকে গৌড় দেশ হয়ে বঙ্গদেশের খরস্রোতা নদী মধুমতীর পূর্ব তীরে নল-নটা জলাভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। কালক্রমে সেখানে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। তাদের আদিনিবাস গোপালগঞ্জকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য এ অঞ্চলের নামকরণ করে গোপালগঞ্জ। আরেক তথ্য অনুযায়ী, ১৭৫৭ সালে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ দখল করার সময় নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা ইংরেজদের একবারে কোণঠাসা করেন। তারা কলকাতা ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এরপর ১৮৫৭ সালে ব্যারাকপুর সেনানিবাসে সিপাহি বিদ্রোহ শুরু হয়। উত্তর প্রদেশের মিরাট থেকে তা ব্যাপক আকার ধারণ করে। মোগল সম্রাটের দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ, তাতিয়া টোপী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ নেতৃত্বে থাকেন। এই বিদ্রোহে মঙ্গল পাণ্ডে প্রথম শহীদ হন। একদল ইংরেজ বণিক মগধ, গৌড়দেশ, নদীয়া পেরিয়ে প্রাণের ভয়ে আরও পূর্বদিকে ঢুকে পড়ে। পূর্বাঞ্চল ছিল জলময় নল-নটার দেশ। কৈবর্ত্য সম্প্রদায়ের লোকেরা সংখ্যায় ছিল বেশি। তারা আশ্রয় নেয় এসব নিভৃতি অঞ্চলে। এলাকার কৈবর্ত্য সম্প্রদায়ের লোকেরা ওই বণিকদের যথাসাধ্য সহযোগিতা করতে থাকে। বণিকরা প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার করে কোনো এক সময় তাদেরকে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ কিছু প্রতিদান গ্রহণ করার অনুরোধ করেন। কিন্তু তাদের ভিতর ছিল না কোনো শিক্ষার আলো। চাওয়া-পাওয়া কিছু নেই বলে তারা জানিয়ে দেয়। ঐ কৈবর্ত্য সম্প্রদায়ের ভিতর একজন নারী ছিল খুবই বুদ্ধিমতী। নাম রানি রাসমণি। সবাই বলল, যদি কিছু দিতে ইচ্ছে হয় তবে ওই রানি রাসমণিকেই দিয়ে যান। বণিকেরা কৃতজ্ঞতাস্বরূপ রানি রাসমণিকে খড়িয়াল, মোকিমপুর, বেলকুলা, নন্দী তেলিহাটি, মিঠাপুর ও সাহাপুর পরগনার জমিদারিত্ব দান করেন। রানি রাসমণির এক নায়েব ছিল। নায়েবের প্রতি ছিল রানি রাসমণির অকৃত্রিম স্নেহ ও ভালোবাসা। ওই নায়েবের এক প্রোপৌত্রের নাম নব গোপাল। রানি রাসমণি নব গোপালের নৈতিকতা ও অসাধারণ প্রতিভা দেখে মুগ্ধ হন। আগে এলাকাটির নাম ছিল 'রাজগঞ্জ'। তিনি নব গোপালের নামটি স্মৃতির পাতায় অক্ষত রাখার জন্য রাজগঞ্জের পরিবর্তে গোপালগঞ্জ নামকরণ করেন। গোপালগঞ্জের যাত্রা সেদিন থেকেই শুরু হয়েছে বলে কথিত।

ইংরেজ আমলে ১৮১১ খ্রিষ্টাব্দে ফরিদপুর একটি স্বতন্ত্র জেলা হয়ে ওঠে। মূলত তিনটি জেলার সমন্বয়ে ফরিদপুর জেলার পূর্ণ বিকাশ ঘটে। ঢাকা জেলার যেসকল অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে ফরিদপুরের সাথে মিশেছে তা বিক্রমপুরের দক্ষিণাংশ। যশোর জেলার যেসকল অংশ এসেছে তা ভূষণা ও ফতেয়াবাদ। আর বাকেরগঞ্জ (বর্তমান বরিশাল) জেলা থেকে যে অংশ এসে মিশেছে তা কতক জলময় সদৃশ। জেলা সৃষ্টির আগে বঙ্গদেশে ১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে যখন রাজত্ব নির্ধারণ করা হয় তখন তার নাম ছিল 'আমল তুমার জুমা'। এটি চালু করেন বাদশা আকবর। তিনি সমগ্র বঙ্গদেশকে ৯টি সরকারে বিভক্ত করেন। প্রত্যেকটি গঠিত হয় কয়েকটি পরগনা নিয়ে। তখন বঙ্গদেশে মোট পরগনার সংখ্যা ছিল ৬৮২টি। এরমধ্যে গোপালগঞ্জের সাহাপুর পরগনার নাম ছিল না। ১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনস্থ সমগ্র বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে জেলা পদ্ধতি চালু হয়। সেসময়ে জেলার সংখ্যা ছিল মাত্র ২৩টি। ওই সময় বর্তমানের ঢাকা, বরিশাল ও ফরিদপুরের অধিকাংশ স্থান ঢাকা-জালালপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৭৯৭ খ্রিষ্টাব্দে জনগণের কল্যাণ ও প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে ঢাকা-জালালপুর জেলাকে দুই ভাগে বিভিক্ত করা হয়। দক্ষিণ অংশের নাম বাকেরগঞ্জ। এর অব্যবহিত পরে বর্তমান গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দে থানা সৃষ্টি হয়। এ সময় গোপালগঞ্জ ও তার পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণাংশের বহুগ্রাম যশোর জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮১১ খ্রিষ্টাব্দে ফরিদপুর একটি স্বতন্ত্র জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। মধুমতির তীরে অবস্থিত গোপীনাথপুর ও চন্দ্রদিঘলিয়া ফরিদপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। গোপীনাথপুরে একটি থানা সৃষ্টি হয়। ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে গোপালগঞ্জে একটি সাবডিভিশন স্থাপিত হয়। ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর কলকাতা গেজেটের ৩৭০০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন অনুসারে তৎকালীন মধুমতী নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত গোপালগঞ্জের উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণে যে সমস্ত গ্রাম যশোর জেলার মধ্যে ছিল, যথা: কঠি, ভোজরগাতি, কন্দর্পগাতি, বাঘাজুড়ি, কাঁড়ারগাতি, খানারপাড়, কালা গোপীনাথপুর, কুড়ানটোলা, গোপালপুর খেলনা, ডালিনা, রায়পাশা, কাটরবাড়ি, ভূতিরিয়া, খাগবাড়ি, মানিকহার, দুর্গাপুর, গড়াই গাতি, আড়পাড়া, খাগাইল, বাজুনিয়া, বরইহাটি, মাঝিগাতি, রঘুনাথপুর, শ্রীরামকান্দি, গরহর ডাঙ্গা প্রভৃতি তা বাকেরগঞ্জ জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে মধুমতি নদীকে যশোর জেলার পূর্ব সীমানা স্থির করে দেওয়ায় গোপালগঞ্জ বাকেরগঞ্জ জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। এই সময়ে রেভিনিউ সার্ভে শেষ হয়। রেভিনিউ সার্ভেয়ারগণ ফরিদপুর ও বারকগঞ্জ জেলার একটি নতুন সীমানা লাইন ঠিক করে দেন। তা গভর্নমেন্ট কর্তৃক গৃহীত হয় ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয়। এরফলে বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলার যে সমস্ত গ্রাম বাকেরগঞ্জ জেলার মধ্যে ছিল তা ফরিদপুরের অন্তর্ভুক্ত হয়। সাহাপুর পরগনাও ফরিদপুরের মধ্যে এলো। কিন্তু গোপালগঞ্জে তখনও থানা সৃষ্টি হয়নি। এই স্থানসমূহ গোপীনাথপুর থানার অন্তর্ভুক্ত হলো। এই অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমানা এভাবে ভাঙা-গড়ার মাধ্যমে এগিয়ে চলতে থাকে। তাই গোপালগঞ্জ জেলা সৃষ্টির পেছনে রয়েছে একটি সুদীর্ঘ ইতিহাস। ১৮৭০ দশকের পরের ইতিবৃত্ত পর্যায়ক্রমে গোপালগঞ্জ জেলার ভৌগোলিক সীমানার ভিতকে শক্ত করে তোলে। ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে গোপীনাথপুর থানা গোপালগঞ্জে আনা হয়। এই সময়ে ফরিদপুর জেলা ২টি সাব-ডিভিশনে বিভক্ত হয়; একটি সদর সাব-ডিভিশনের অধীনে থাকে।

৭.৬.৩ রায় বাড়ি মঠ

রায় বাড়ি মঠ

গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলার মহেশপুর ইউনিয়নের বাগিয়া গ্রামে রায় বাড়ি নামে একটি পুরানো বাড়ি ছিল। এরা জোদ্দার ছিল বলে জানা যায়। বর্তমানে বাড়িটি নিশ্চিহ্ন। এই রায় বাড়ির পাশেই একটি পুরানো মঠ রয়েছে। এটি রায় বাড়ি মঠ বলেই অধিক পরিচিত। ভৌগোলিক অবস্থান উত্তর ২৩°১৬/০০.০// অক্ষাংশ এবং পূর্ব ০৮৯°৪৮/ ১৯.০// দ্রাঘিমাংশ। মঠের আয়তন তিন বর্গমিটার। এর চারদিকেই প্রবেশ পথ রয়েছে। উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব দিকের প্রবেশপথ তিন ভাঁজযুক্ত ডাবল কৌণিক খিলানযুক্ত। পশ্চিম দিকের প্রবেশপথ অর্ধবৃত্তাকার। প্রবেশপথগুলো দুপাশে একাধিক গোলাকার কলাম বা পিলাস্টার ব্যবহার করা হয়েছে। কলামগুলোর পরিধি প্রায় ৮৬ সেমি।

৭.৬.৪ গোঁসাই বাড়ি মঠ

গোঁসাই বাড়ি মঠ

গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলার মহেশপুর ইউনিয়নের বাগিয়া একটি গ্রাম। এই উপজেলা সদর থেকে ১৫ কিলোমিটার পূর্বে এবং মাঝিগাতী বাসস্ট্যান্ড থেকে ৩ কিলোমিটার পূর্বে এই বাগিয়া গ্রামে একটি পুরনো মঠ রয়েছে। যার ভৌগোলিক অবস্থান উত্তর ২৩°১৬/০১.১// অক্ষাংশ এবং পূর্ব ০৮৯° ৪৮/ ১২.২// দ্রাঘিমাংশ। ভূমি থেকে ৬০ সেমি. উঁচু প্ল্যাটফরমের উপর মঠের আয়তন প্রায় ২.৪৩ বর্গমিটার। এটি একটি পঞ্চরত্ন মঠ এবং মঠটি দক্ষিণমূখী। উচ্চতা আনুমানিক ৯ মিটার। দেয়ালের প্রশস্ততা ৫২ সেমি। অর্ধবৃত্তাকার খিলানের দরজা রয়েছে এ মঠে। দরজার উচ্চতা ১.৮২ মিটার এবং প্রশস্ততা ৮২ সেমিঃ। ছাদ ভল্টেড। মঠটি পঞ্চরত্ন বিশিষ্ট। ছাদের চারকোণে চারটি এবং মাঝখানে একটি চূড়া রয়েছে। মাঝখানের চূড়াটি তুলনামূলক বড়। চূড়াগুলো দুটি অংশ ভাগ করা যায়।নিচের অংশ চারকোনাকার এবং তার উপর চারকোনাকারে ক্রমান্বায়ে সূক্ষ্ম চূড়ায় শেষ হয়েছে। মঠের দেয়ালে ব্যবহৃত ইট এর পরিমাপ ২৩ সেমি × ১২ সেমি × ৭ সেমি, ২৩ সেমি × ১১ সেমি × ৬ সেমি।

৭.৭ হাতিয়ারা ইউনিয়ন, কাশিয়ানী

৭.৭.১ বড়বাড়ি ঘাটলা বান্ধা পুকুর

উপজেলা সদর থেকে ৩৫ কিমি. পূর্ব-দক্ষিণে হাতিয়ারা গ্রাম। এই গ্রামের নাম অনুসারে ইউনিয়নের নামও হাতিয়ারা। কাশিয়ানী সাতপাড় সড়কের উত্তর পাশে হাতিয়ারা পশ্চিম পাড়ায় বড়বাড়ি নামে একটি বাড়ি আছে। স্থানীয় মানুষ বড়বাড়ি হিসাবে জানে। এই বড়বাড়ির দক্ষিণে একটি ছোট পুকুর আছে। পুকুরটির আয়তন প্রায় ৪০ মিটার × ৩৩ মিটার। পুকুরটির উত্তর এবং পশ্চিম পাড়ে শান বাঁধানো ঘাট আছে। স্থানীয় মানুষজন বড়বাড়ি ঘাটলা বান্ধা পুকুর বলে জানে। ঘাট ভেঙে পড়েছে। ঘাটে ব্যবহৃত ইটবালি ঔপনিবেশিক আমলের মনে হয়। ফলে এখানে ঔপনিবেশিক আমলে ঘাটটি বাঁধানো হয়েছিল। ইসমাইল হোসেন নানক জনৈক ব্যক্তি এবং তার পরিবার এখানে বসবাস করত এবং তাদের বাড়িটিকে বড়বাড়ি বলত।

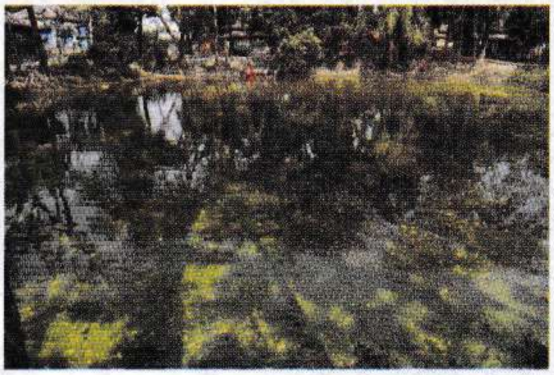

বড়বাড়ি ঘাটলা বান্ধা পুকুর

৭.৭.২ হাতিয়ারা মঠ

গোপালগঞ্জ জেলা সদর হতে ৪০ কিমি উত্তরে ও কাশিয়ানী উপজেলা সদর হতে ৩৫ কিমি পূর্ব-দক্ষিণে কাশিয়ানী সাতপাড় রাস্তার ৩০০ মিটার উত্তরে হাতিয়ারা পশ্চিম পাড়ায় একটি মঠ আকৃতির কাঠামো রয়েছে। স্থানীয়ভাবে জরিপ পিলার যা হাতিয়ারা মঠ হিসাবে পরিচিত। ভৌগোলিক অবস্থান ২৩°০৯/ ৩২.৪// উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯° ৫২/ ১০.২// পূর্ব দ্রাঘিমাংশ।

প্রায় বর্গাকার কাঠামোটির আয়তন উত্তর-দক্ষিণে ১২/-৮// পূর্ব পশ্চিমে ১৩/-০//। মঠের উচ্চতা ৪০/-০// মঠের পূর্ব ও পশ্চিমে দরজা রয়েছে। মঠের দেয়াল ১/-৬// পুরু। চার দেয়ালেই প্রায় ২০/ উপরে কুলঙ্গি রয়েছে। দরজা ৩/-৩//। পাইপদিয়া মঠের অনুরূপ।

হাতিয়ারা মঠ

হাতিয়ারা ইউনিয়ন ৫টি গ্রাম নিয়ে গঠিত। হাতিয়ারা, পুইশ্যর, ভুলবাড়িয়া, বাহুসড় ও পাথর গ্রাম।

৭.৮ বেথুড়ি ইউনিয়ন

৭.৮.১ সন্তোষ বিশ্বাস এর বাড়ি

উপজেলা সদর থেকে ১৫ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে রামদিয়া বাজার। রামদিয়া বাজার থেকে ৫০০ মিটার পূর্বে রামদিয়া লালের পূর্ব দিকে সন্তোষ বিশ্বাস এর বাড়ি। যার ভৌগোলিক অবস্থান ২৩°১০/ ৩১.২// উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯° ৪৮/ ৫৫.৭// পূর্ব দ্রাঘিমাংশ।

বেথুড়ি ইউনিয়নের ঘৃতকান্দি গ্রামে সন্তোষ বিশ্বাস এর দোতলা জরাজীর্ণ বাড়ি। ভবনটির অনেকাংশ বর্তমানে ভেঙে গেছে। ছাদ সমতল, ছাদে লোহার কড়ি, বর্গা ও টালি ইট ব্যবহার করা হয়েছে। দোতলার বারান্দায় লোহার রেলিং আছে। ভবনটিতে ব্যবহৃত ইটের পরিমাপ ২৮ সেমি. × ১৪ সেমি. × ৭-৫ সেমি.। ভবনের সামনের দক্ষিণের বারান্দায় লোহার পিলার রয়েছে। ভবনটি ঔপনিবেশিক আমলের শেষের দিকে নির্মিত হয়ে থাকতে পারে।

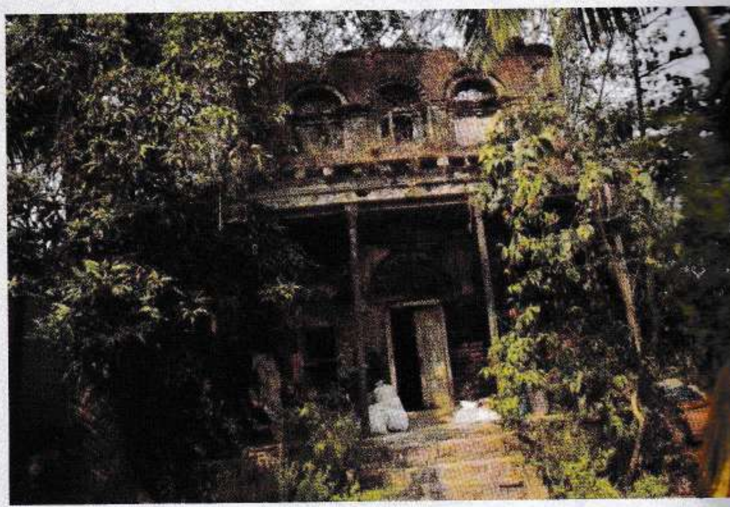

সন্তোষ বিশ্বাস এর বাড়ি

৭.৮.২ টুনিবাড়ি

সন্তোষ বিশ্বাসের বাড়ি থেকে ৫০০ মিটার উত্তরে ঘৃতকান্দি গ্রামে টুনিবাড়ি অবস্থিত। যার ভৌগোলিক অবস্থান ২৩°১০/ ০৭.৩// উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯° ৪৯/ ০৬.৯// পূর্ব দ্রাঘিমাংশ।

টুনিবাড়ি ১৫ মিটার × ৩ মিটার আয়তনের ছোট একটি ঘর। চুন-সুরকি দিয়ে গাঁথা ঔপনিবেশিক আমলে নির্মিত একটি ঘর।

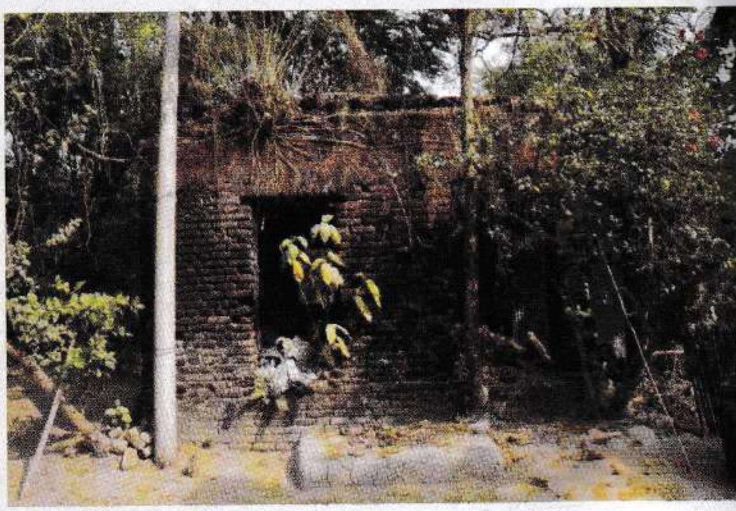

টুনিবাড়ি

৭.৯ ফুকরা ইউনিয়ন

৭.৯.১ চন্দ্রবিলাস মুখার্জী বাড়ি

গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলার ফুকরা ইউনিয়নের ধল গ্রামে চন্দ্রবিলাস মুখার্জী বাড়ি নামে পুরনো বাড়ি রয়েছে। এই বাড়িতে কয়েকটি ভবন ছিল। বর্তমানে মাত্র একটি দোতলা ভবন টিকে আছে। বাকিগুলো নিশ্চিহ্ন প্রায়। তবে ভিটার চিহ্নগুলো বুঝা যায়। উপজেলা সদর থেকে ১৫ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত এ বাড়িটি। দোতলা বিশিষ্ট বাড়িটি ওলিয়ার রহমান নামে মুসলিম পরিবার বাংলা ১৩৫৩ সনে কিনে নেয় বলে জানা যায়। ছাদে লোহা ও কাঠের কড়ি বর্গা ব্যবহার কারা হয়েছে। টালি ব্যবহার করা হয়েছে ছাদে। দেয়ালে ইট, চুন ও সুরকির গাঁথুনি ব্যবহার করা হয়েছে। দেয়ালের প্রশস্ততা ৬৩ সেমি। দোতলা ভবনের আয়তন ১৮.৫৫ মিটার × ৬ মিটার। বারান্দায় ডাবল গোলাকার কলাম ব্যবহার করা হয়েছে। দেয়ালে চুন সুরকির ফুলের নকশা আছে। বাড়িটি সংস্কার করা হয়েছে। বর্তমানে একটি মুসলিম পরিবার বসবাস করে চলছে।

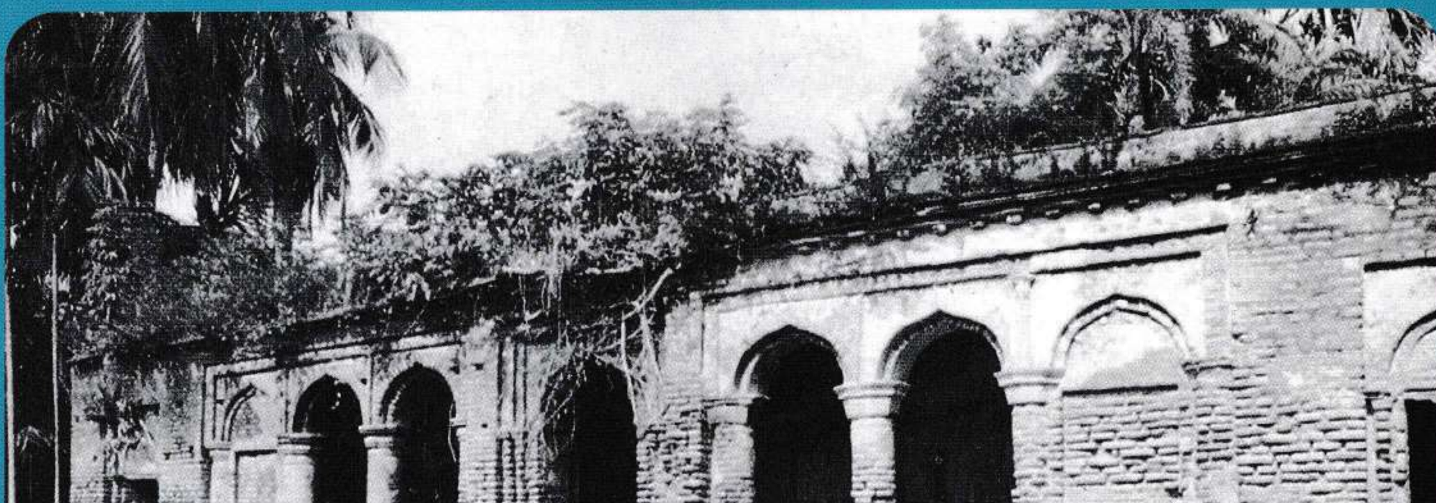

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।
Web : www.archaeology.gov.bd
E-mail: director_general@archaeology.gov.bd

মহাস্থানগড় দুর্গনগরীর অভ্যন্তরীণ বৈরাগীর ভিটা প্রত্নস্থলের প্রত্নতাত্ত্বিক খনন প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ খ্রি.

আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়
রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চল, বগুড়া
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ভূমিকাঃ

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য প্রাচীন পুরাকীর্তির নিদর্শন ও ধ্বংসাবশেষ। সংস্কৃতি ও প্রাচীন ঐতিহ্যে বাংলাদেশ অতি সমৃদ্ধ। দু'সহস্র বৎসর কিংবা আরও অধিককাল বিভিন্ন রাজা ও শাসকদের শাসনের অতীত ইতিহাস এবং ফেলে আসা অতীতের অসংখ্য পুরাকীর্তি যেমন মন্দির, স্তূপ, বিহার, রাজপ্রাসাদ, মসজিদ, সমাধি এবং দুর্গ প্রভৃতি আজও কালের কটাক্ষকে উপেক্ষা করে সগর্বে টিকে আছে। জাতি বাচক 'পণ্ড্র' শব্দের প্রাচীনতম উল্লেখ আমরা দেখি ঐতরের ব্রাহ্মণ্যে (খ্রিষ্টপূর্ব ৮ম শতাব্দী)। প্রাচীন এই পুণ্ড্রনগর বর্তমানে মহাস্থান নামে পরিচিত। বগুড়া জেলা শহর হতে প্রায় ১৩ কিমি উত্তরে করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে এবং জাহাজঘাটা প্রত্নস্থলের দক্ষিণ-পশ্চিমে বৈরাগীর ভিটা প্রত্নস্থলটি অবস্থিত।

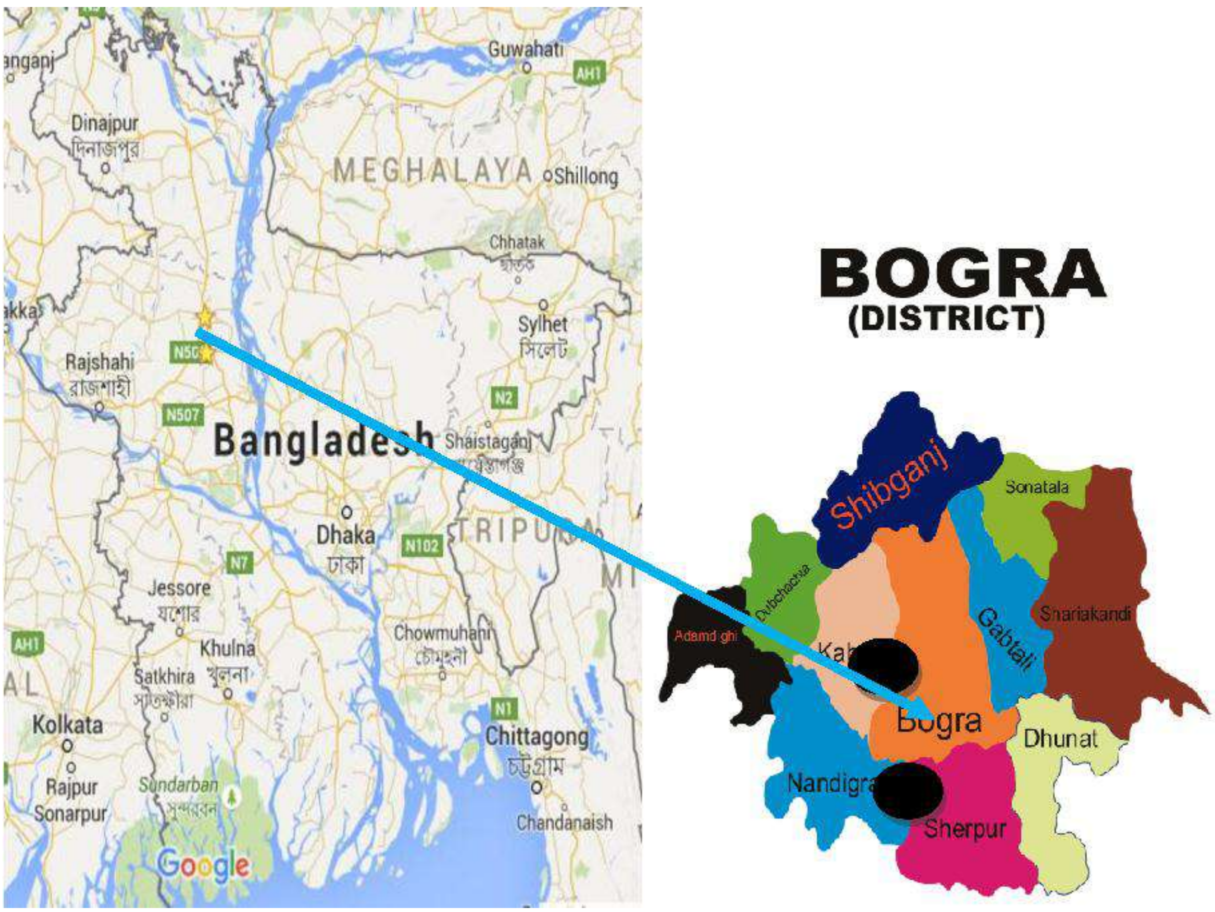

বাংলাদেশ এবং বগুড়া জেলা শহরের মানচিত্র।

B.V.M-2021-2022.178.21 পোড়ামাটির তৈরি সাধারণ লাল বর্ণের বাটির ভগ্নাংশ। তলার অংশ চাকতির ন্যায় এবং প্রান্তভাগ বাইরের দিকে ছড়ানো। ব্যাস ১০.৫ সেমি।

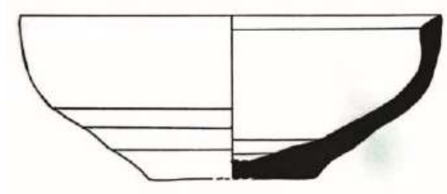

মতামত:

মহাস্থান দুর্গনগরীর অভ্যন্তরে বৈরাগীর ভিটা প্রত্নস্থলটিতে ১৯২৮-২৯ সালে উৎখনন করা হয় এবং সে সময়ে দুটি নির্মাণ পর্যায়ের বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ উন্মোচিত হয়। দীর্ঘ বিরতির পর ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এখানে পুনরায় প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন আরাম্ভ করা হয় এবং পরপর ৩ অর্থবছরে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন পরিচালনা করা হয়। ফলে বৈরাগীর ভিটা প্রত্নস্থলে মাটির নিচে লুকিয়ে থাকা প্রত্নসম্পদ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করা যায়। মূলত প্রত্নস্থলটি দুটি অংশে বিভক্ত। এর দক্ষিণ অংশে একাধিক মন্দির বা ধর্মীয় স্থাপনাসহ উপর্যুপরি স্থাপত্য কাঠামো নির্মাণের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। অন্য দিকে এ প্রত্নস্থানের উত্তরাংশে প্রশস্ত বেষ্টনী প্রাচীর দ্বারা আবৃত প্রায় ৩৩.০০ মি. × ২৩.০০ মি. পরিমাপের একটি স্থান যেখানে বেষ্টনী প্রাচীর অভ্যন্তরে চার কোণায় চারটি বর্গাকার কাঠামোর ধ্বংসাবশেষ উন্মোচিত হয়। এ কাঠামোসমূহকে বৌদ্ধ স্তূপ বলে প্রাথমিক ভাবে ধারণা করা যায়। এছাড়াও উন্মোচিত বেষ্টনী প্রাচীরের অভ্যন্তরে আয়াতাকার পরিকল্পনায় নির্মিত স্থাপত্য কাঠামোটিকে একটি বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বলে অনুমিত হয়। প্রত্নস্থানের এই অংশটিতে একাধিক নির্মাণ পর্যায়ের চিহ্ন দেখা যায় না। এখানে ব্যবহৃত ইটের আকার ও আয়তন অপেক্ষাকৃত বড় এবং অক্ষত। দেয়ালের দুই প্রান্ত এবং মধ্যবর্তী অংশে পূর্ণাঙ্গ ইটের ব্যবহার দেখা যায়। ফলে এসব স্থাপনা থেকে অনায়াসে ইট উঠিয়ে নিয়ে পুনরায় অন্য কোনো স্থাপনায় ব্যবহৃত হয়েছিল বলে ধারণা করা যায়। এ স্থাপনাসমূহের ব্যবহৃত ইটের পরিমাপ, দেয়ালের গাঁথুনিতে মসলার ব্যবহার দেখে ৬ষ্ঠ-৭ম শতকে নির্মিত বৌদ্ধ মন্দির ও বৌদ্ধ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ বলে ধারণা করা যায়।

শের-ই-বাংলা স্মৃতি জাদুঘর

উপমহাদেশের অবিসংবাদিত মহান নেতা আবুল কাশেম ফজলুল হক ছিলেন অবিভক্ত বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও অসীম সাহসের জন্য তিনি শের-ই-বাংলা বা বাংলার বাঘ নামে পরিচিত। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর ১৯৮২ সালে বরিশাল শহর থেকে ২৪ কিমি দূরে অবস্থিত বানারীপাড়া উপজেলার চাখার ইউনিয়নে শের-ই-বাংলা এ কে ফজলুল হকের পূর্বপুরুষদের বাড়িসংলগ্ন স্থানে শের-ই-বাংলা স্মৃতি জাদুঘর নির্মিত হয়। পাঁচ কক্ষ বিশিষ্ট এ জাদুঘর ভবনে ৩টি প্রদর্শনী গ্যালারি, ১টি অফিস কক্ষ ও ১টি বিশ্রামাগার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

প্রদর্শনী পরিকল্পনা ঃ

প্রদর্শনী পরিকল্পনার শুরুতেই শের-ই-বাংলা এ কে ফজলুল হকের একটি প্রতিকৃতি, তাঁর কর্মময় জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও বংশ পরিচয়। প্রথম গ্যালারিতে ৭টি শো-কেস রয়েছে যাতে শের-ই-বাংলা এ কে ফজলুল হকের পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক কার্যক্রমের ছবি ও পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন সময়ের ছবি রয়েছে। এ গ্যালারিতে আরো রয়েছে এ কে ফজলুল হকের স্বহস্তে লিখিত বিভিন্ন চিঠি ও বিভিন্ন দলিল দস্তাবেজ।

জাদুঘরের ২ নম্বর গ্যালারিতে রয়েছে শের-ই-বাংলার ব্যবহৃত একটি টেবিল, চারটি চেয়ার, একটি ছড়ি, একটি সিলমোহর, একটি রূপার কর্ণি, একটি কাচের গ্লাস ও একটি ক্রেস্ট।

বর্ণিত এ গ্যালারিতে আরও রয়েছে তাঁকে উপহার হিসেবে পাঠানো একটি কুমিরের চামড়ার তৈরি অনুকৃতি।

এছাড়াও রয়েছে শের-ই-বাংলা এ কে ফজলুল হকের বিভিন্ন রাজনৈতিক কার্যক্রমের ছবি ও তাঁর সম্মানে রচিত বিভিন্ন মানপত্র।

জাদুঘরের ৩ নম্বর গ্যালারিতে প্রদর্শিত হচ্ছে তাঁর ব্যবহৃত একটি ড্রেসিং টেবিল ও টুল, একটি আরাম কেদারা, একটি আলনা ও একটি খাট।

শের-ই-বাংলা এ কে ফজলুল হকের সংক্ষিপ্ত জীবনী
(১৮৭৩-১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ)

সন	ঘটনাপঞ্জি
১৮৭৩	২৬ অক্টোবর মাতুলালয়ে (নানা বাড়ি) জন্মগ্রহণ করেন। পিতা- কাজী মুহাম্মদ ওয়াজিদ আলী, মাতা-বেগম সায়িদুন্নিসা। খ্রিষ্টীয় ১৮ শতকে শের-ই-বাংলার পূর্বপুরুষ বিচারকের চাকরি নিয়ে বরিশাল জেলাধীন পটুয়াখালী মহকুমার অর্ন্তগত বাউফল থানার বিলবিলাস গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর প্রপিতামহ কাজী মুহাম্মদ আমিন বরিশাল জেলার পিরোজপুর মহাকুমার বানারীপাড়া থানার চাখার গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। শৈশবে তিনি বাড়ির কাছের মক্তবে শিক্ষা জীবন শুরু করেন। মাতুলালয়: গ্রাম- সাতুরিয়া, উপজেলা- রাজাপুর, জেলা- ঝালকাঠি।
১৮৯০	বরিশাল জেলা স্কুল হতে ছাত্র বৃত্তিসহ এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।
১৮৯২	কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে এফ. এ. পাস করে বৃত্তি লাভ করেন।
১৮৯৪	কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে তিনটি বিষয়ে (গণিত, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্র) একই সাথে প্রথম শ্রেণির অনার্সসহ বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।
১৮৯৬	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিত শাস্ত্রে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। ঢাকার সৈয়দ আহমদের কন্যা এবং নবাব আব্দুল লতিফের নাতনী খুরশিদ তালাত বেগমকে বিবাহ করেন। এ স্ত্রীর গর্ভে তাঁর দুই কন্যা নফিসী বেগম ও রইসী বেগম জন্মগ্রহণ করে।
১৮৯৭	কলকাতা ইউনিভার্সিটির ল কলেজ থেকে বি.এল.ডিগ্রি লাভ করে স্যার আশুতোষ মুখার্জীর অধীন শিক্ষানবিশ হিসেবে কলকাতা হাইকোর্টে নিজের নাম তালিকাভুক্ত করেন।
১৯০০	স্যার আশুতোষ মুখার্জীর সাথে শিক্ষানবিশ শেষে কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন।
১৯০১	পিতা মৃত্যুবরণ করায় কলকাতা থেকে বরিশালে আসেন এবং বরিশালে আইন ব্যবসা শুরু করেন। আইন ব্যবসার পাশাপাশি
	বরিশাল রাজচন্দ্র কলেজে গণিত বিষয়ে খণ্ডকালীন প্রভাষক হিসেবে কাজ করেন।
১৯০৬	৩০ডিসেম্বর ঢাকায় সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতেও তিনি সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন।
১৯০৮	নবাব স্যার সলিমুল্লাহ'র আমন্ত্রণে ঢাকায় অল-ইন্ডিয়া মুসলিম এডুকেশনাল কনফারেন্সে যুগ্ম-সম্পাদক হিসেবে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। এর কিছুদিন পর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে চাকরি গ্রহণ করেন। পরে জামালপুরে এস.ডি.ও. হিসেবে বদলি হন। অতঃপর মাদারীপুরে এস.ডি.ও. হিসেবে চাকরি করার পর সরকার তাঁকে সমবায় বিভাগের সহকারী রেজিস্ট্রার পদে নিয়োগ করে।
১৯১২	১৯১২ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কাউন্সিলের ঢাকা বিভাগীয় পদ শূন্য হয়। নবাব স্যার সলিমুল্লাহ ও বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্তের অনুরোধে ফজলুল হক ঢাকা কেন্দ্রের নির্বাচনে প্রার্থী হন।
১৯১৩	আইন পরিষদে প্রবেশ করে ফজলুল হক সরকারের বঙ্গভঙ্গ রদ করা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা করেন এবং মুসলমানদের প্রতি অবিচার ও অন্যায় বলে অবহিত করেন। তিনি অত্যন্ত জোরালোকণ্ঠে এর জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। তিনি সরকারকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে, প্রয়োজন বোধে মুসলমানেরা এ আন্দোলন ভবিষ্যতে তাদের অধিকার ও আত্মরক্ষার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হবে না।
১৯১৪	ফজলুল হক নিখিল ভারত কংগ্রেস দলে যোগদান করেন। পাশাপাশি মুসলিম লীগের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত ছিল।
১৯১৫	কৃষক প্রজা আন্দোলন শুরু করেন।
১৯১৬	ফজলুল হক ফরিদপুর শহরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের বাৎসরিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।
১৯১৮	দিল্লিতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অধিবেশনে ফজলুল হক সভাপতিত্ব করেন।
১৯২০	ফজলুল হক নিখিল ভারত মুসলিম লীগ এবং কলকাতা নিখিল ভারত খেলাফত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।
১৯২১	মাতা সায়িদুন্নিসা পরলোক গমন করেন। মুসলিম ছাত্রদের স্কুল ত্যাগের বিরোধিতা করে ফজলুল হক কংগ্রেস ত্যাগ করেন।
১৯২২	খুলনায় উপ-নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হন
১৯২৪	১৯২৪ সালের ১ জানুয়ারি এ কে ফজলুল হক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী হন।
১৯২৫	পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার ফুরফুরা পীর মাওলানা ইবনে আহমেদের কন্যা ও পীর মাওলানা আবু বকরের ভ্রাতুস্পুত্রী বেগম জিন্নাতুন্নেছাকে বিবাহ করেন।
১৯৩০-৩১	লন্ডনে ঐতিহাসিক গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন।
১৯৩১-৩২	লন্ডনে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন।
১৯৩৪	বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৩৫	কলকাতা কর্পোরেশনের প্রথম মুসলিম মেয়র নির্বাচিত হন।
১৯৩৭	মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টি যৌথভাবে মন্ত্রিসভা গঠন করে। ফজলুল হক হলেন এ মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী। এ মন্ত্রিসভা ঋণ সালিসি বোর্ড ও মহাজনী আইন কার্যকরী করে। লক্ষ্ণৌতে ভারত মুসলিম লীগের ঐতিহাসিক এক সম্মেলনে তিনি উর্দুতে অনলবর্ষী, মর্মস্পর্শী এবং বীরত্বব্যঞ্জক বক্তৃতা প্রদান করেন। এ জন্য লক্ষ্ণৌবাসী সে সম্মেলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁকে শেরে বাংলা জিন্দাবাদ ধ্বনি তুলে জীবনের তরে তাঁকে শের-ই-বাংলা খেতাবে ভূষিত করেন।
১৯৪০	লাহোরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অধিবেশনে পাকিস্তান সৃষ্টির লক্ষ্যে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং তা অনুমোদিত হয়। চাখার কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফজলুল হক হল প্রতিষ্ঠা করেন।
১৯৪১	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পেক্ষাপটে ভারতের বড়লাট কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে তিনি সমর পরিষদে যোগদান করেন। ফলে মুসলিম লীগের সভাপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সাথে মতানৈক্য হয় এবং জিন্নাহ তাঁকে মুসলিম লীগ থেকে বহিষ্কার করেন। ফলে মন্ত্রিসভার পতন হয় এবং ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ও অন্যান্যদের নিয়ে দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা গঠন করেন। যা শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা হিসেবে খ্যাত।
১৯৪৩	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ব্রিটিশ সরকারের পোড়ামাটি নীতির সাথে একমত হতে না পেরে ২৯ মার্চ মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করেন।
১৯৪৪	একমাত্র পুত্র আবুল কালাম ফায়জুল হক জন্মগ্রহণ করেন।
১৯৪৬	১৬ আগস্ট কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। সে সময় হক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পুনরুদ্ধার করতে এবং কলকাতার হিন্দু প্রতিবেশীদের রক্ষা করতে চেষ্টা করেন।নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বরিশাল সদর দক্ষিণ ও খুলনার বাগেরহাট কেন্দ্র হতে জয়লাভ করেন।
১৯৪৭	পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর কলকাতা থেকে ঢাকায় আসেন ও আইন ব্যবসা শুরু করেন এবং এ্যাডভোকেট জেনারেল পদ অলংকৃত করেন। ১৯৫২ সাল পর্যন্ত তিনি রাজনীতিতে প্রায় নিষ্ক্রিয় ছিলেন।
১৯৫৩	রাজনীতিতে পুনরায় সক্রিয় হন। কৃষক-প্রজা পার্টিকে সময়োপযোগী করে কৃষক শ্রমিক দল নামে পুনঃগঠন করেন।
১৯৫৪	রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল রূপ ধারণ করায় কৃষক শ্রমিক দল, আওয়ামী মুসলিম লীগ, গণতন্ত্রী দল ও নেজাম-ই ইসলামী এর সমন্বয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করে এবং শের-ই-বাংলা পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হন। ৩০ মে করাচি কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে স্বগৃহে অন্তরীণ করে।
১৯৫৫	মোহাম্মদ আলী চৌধুরী মন্ত্রিসভায় পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে ১১ আগস্ট শপথ গ্রহণ করেন।
১৯৫৬	শের-ই-বাংলার অদম্য উৎসাহে, অসীম আগ্রহে এবং অমানুষিক পরিশ্রমে আট মাসের মধ্যে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচিত হয় এবং ২৩ ফেব্রুয়ারি জাতীয় পরিষদে তা গৃহীত হয়। অতঃপর

	তিনি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত হন।
১৯৫৮	১ এপ্রিল গভর্নর পদ হতে অপসারিত হন এবং রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।
১৯৬২	২৭ এপ্রিল তিনি ঢাকায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তথ্যসূত্রঃ বাংলাপিডিয়া ও অন্যান্য।

পরিদর্শনের সময়সূচি

গ্রীষ্মকালীন সময়সুচি ঃ

১ এপ্রিল থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর
মঙ্গল থেকে শনিবার
সকাল ১০:০০টা থেকে বিকাল ০৬:০০টা
সোমবার দুপুর ০২:০০টা থেকে বিকাল ০৬:০০টা
রবিবার সাপ্তাহিক বন্ধ

শীতকালীন সময়সুচি ঃ

১ অক্টোবর থেকে ৩১ মার্চ
মঙ্গল থেকে শনিবার
সকাল ০৯:০০টা থেকে বিকাল ০৫:০০টা
সোমবার দুপুর ০১:৩০টা থেকে বিকাল ০৫:০০টা
রবিবার সাপ্তাহিক বন্ধ

আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
e-mail:archaeologykhulna@yahoo.com
web:http://archaeology.khulnadiv.gov.bd

প্রথম প্রকাশকালঃ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

শের-ই-বাংলা স্মৃতি জাদুঘর

আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
খুলনা ও বরিশাল বিভাগ
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মঠেরচালা প্রত্নতাত্ত্বিক খনন প্রতিবেদন

কালিয়াকৈর, গাজীপুর

(২০১৩-২০১৫ খ্রিস্টাব্দ)

আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মঠেরচালা প্রত্নতাত্ত্বিক খনন প্রতিবেদন
কালিয়াকৈর, গাজীপুর
(২০১৩-২০১৫ খ্রিস্টাব্দ)

প্রকাশনা: আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়,
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ।

প্রকাশকাল:

মুদ্রণ:

স্বত্ব: প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর,
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মূল্য:

ISBN: 978-984-35-2556-7

বাণী

গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলাধীন মঠেরচালায় পরিচালিত প্রত্নতাত্ত্বিক খনন প্রতিবেদন প্রকাশ আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা তথা প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের একটি আবশ্যকীয় কাজ হল প্রত্নতাত্ত্বিক খনন পরিচালনা। ইতিহাসের বস্তুগত উপাদান সংগ্রহে, ইতিহাসের সত্যানুসন্ধানে ও ইতিহাসের নতুন দিক উন্মোচনে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন একটি অত্যাবশ্যকীয় কর্ম। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের মাধ্যমেই একটি জাতির প্রাচীন জনগোষ্ঠীর সমাজ ব্যবস্থা, ধর্মীয় জীবন, সংস্কৃতি, অর্থনীতি সর্বোপরি সামগ্রীক জীবনধারণ প্রণালী সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা সম্ভব হয়। আর এ সকল কারণেই আলোচ্য প্রতিবেদনটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। একটি দেশ ও জাতির প্রাচীন ইতিহাস-ঐতিহ্য কতটুকু গৌরবময় ও সমৃদ্ধ ছিল তা জানতে এ ধরণের প্রকাশনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এছাড়া উৎখননে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রত্নবস্তু ও নতুন তথ্য উপাত্ত ঐতিহাসিক, প্রত্ন গবেষক, প্রত্নপ্রেমিক তথা সাধারণ জনগণের নিকট পৌঁছাতে এবং গাজীপুর জেলার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও এ প্রকাশনা কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। আশা করি, এ ধরণের প্রকাশনা একদিকে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের ভাবমূর্তি সমুজ্জ্বল করবে অন্যদিকে ইতিহাস চর্চার পথকে করবে আরও মসৃণ।

উৎখননকার্য পরিচালনায় ও উৎখনন প্রতিবেদন প্রকাশনায় অধিদপ্তরের সহকর্মীগণ ও সম্পাদকমণ্ডলীসহ যেসকল ব্যক্তি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তাদের সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

রতন চন্দ্র পণ্ডিত
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর

সম্পাদনা বোর্ডের সদস্যবৃন্দ

রতন চন্দ্র পণ্ডিত
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, ঢাকা।

সুব্রত ভৌমিক
যুগ্মসচিব (প্রত্নতত্ত্ব ও জাদুঘর অধিশাখা)
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ
অধ্যাপক
প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

স্থপতি ড. আবু সাঈদ এম আহমেদ
অধ্যাপক
ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক, ঢাকা।

মালিহা নার্গিস আহমেদ
অধ্যাপক
প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

মোঃ আমিরুজ্জামান
উপ-পরিচালক (প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ)
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, ঢাকা।

ড. মোঃ আতাউর রহমান
উপ-পরিচালক (প্রকাশনা)
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, ঢাকা।

সার্বিক তত্ত্বাবধান

ড. মোঃ আতাউর রহমান (২০১৩-২০১৪ অর্থবছর)
রাখী রায় (২০১৪-২০১৫ অর্থবছর
আঞ্চলিক পরিচালক
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
ঢাকা বিভাগ, ঢাকা

গবেষণা ও প্রতিবেদন

মোছাঃ নাহিদ সুলতানা (**২০১৩-২০১৪ অর্থবছর**)
মোঃ মাহাবুব-উল আলম (২০১৪-২০১৫ অর্থবছর)
সহকারী পরিচালক

উৎখনন দল

মোছাঃ নাহিদ সুলতানা (**২০১৩-২০১৪ অর্থবছর**)
সহকারী পরিচালক
মোঃ মাহাবুব-উল আলম (২০১৪-২০১৫ অর্থবছর)
সহকারী পরিচালক
নাসিমা শাহিন
ফিল্ড অফিসার
সাবিনা ইয়াসমিন
গবেষণা সহকারী

আলোকচিত্র ধারণ

এম এ মান্নান
প্রধান আলোকচিত্রকর

নকশা অঙ্কন

তৃপ্তি রানী হালদার
সিনিয়র ড্রাফটসম্যান

হিসাবরক্ষণ

মিজানুর রহমান
ভাণ্ডার রক্ষক

সহযোগিতায়

মোঃ শাকিল হাওলাদার
অফিস সহায়ক

সূচিপত্র

বিষয় **পৃষ্ঠা নং**

অধ্যায় ০১: মঠেরচালা পরিচিতি

১.১ অবস্থান
১.২ নামকরণ
১.৩ সংরক্ষিত পুরাকীর্তি ঘোষণা
১.৪ মঠেরচালা এবং এর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ
১.৫ গাজীপুর জেলা
১.৬ ঐতিহাসিক পটভূমি
১.৭ ভূ-প্রকৃতি
১.৮ উদ্ভিজ্জ
১.৯ নৃ-তত্ত্ব ও জনগোষ্ঠী

অধ্যায় ০২: প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও পর্যালোচনা (২০১৩-২০১৪ অর্থবছর)
মোছাঃ নাহিদ সুলতানা

অধ্যায় ০৩: প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও পর্যালোচনা (২০১৪-২০১৫ অর্থবছর)
মোঃ মাহবুব-উল আলম

৩.১ পটভূমি
৩.২ স্থাপত্যিক কাঠামোর বিবরণ
৩.৩ ব্লক এ
৩.৪ বর্গাকার মন্দির সদৃশ স্থাপনা
৩.৫ মঞ্চ
৩.৬ স্থাপনার দেয়াল
৩.৬.১ স্থাপনার প্রবেশপথ
৩.৬.২ কর্নার টারেট
৩.৬.৩ পিলাস্টার
৩.৬.৪ মেঝে
৩.৬.৫ পানি নিষ্কাসন নালা
৩.৬.৬ পাথরের বেদি
৩.৭ স্থাপনার অলংকরণ
৩.৮ স্থাপনার আঙ্গিনা
৩.৮.১ অন্দর আঙ্গিনা
৩.৮.২ বহিরাঙ্গন
৩.৯ ব্লক-বি
৩.১০ ব্লক সি
৩.১১ নির্মাণসামগ্রী ও কৌশল
৩.১২ **স্তরায়ন**
৩.১৩ নির্মাণকাল

অধ্যায় ০৪: খননে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রত্নবস্তু

৪.১ আলংকারিক ইট
৪.২ মাটির পাত্র ও খোলামকুচি
৪.৩ গ্লেজ্‌ড ওয়্যার
৪.৪ সাধারণ ওয়্যার
৪.৫ ব্রিটিশ মুদ্রা
৪.৬ মুসলিম মুদ্রা
৪.৭ পাথরের তৈরি প্রত্নবস্তু
৪.৮ কাঁচের গুটিকা
৪.৯ পোড়ামাটির তৈরি প্রত্নবস্তু

অধ্যায় ০৫: উৎখনন ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত সেমিনার

অধ্যায় ০৬: উপসংহার: একটি সার্বিক পর্যালোচনা

মোঃ মাহবুব-উল আলম

অধ্যায় ০১
মঠেরচালা পরিচিতি

১.১ অবস্থান
১.২ নামকরণ
১.৩ সংরক্ষিত পুরাকীর্তি ঘোষণা
১.৪ মঠেরচালা এবং এর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ
১.৫ গাজীপুর জেলা
১.৬ ঐতিহাসিক পটভূমি
১.৭ ভূ-প্রকৃতি
১.৮ উদ্ভিজ্জ
১.৯ নৃ-তত্ত্ব ও জনগোষ্ঠী

১.১ অবস্থান

গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার অন্তর্গত চাপাইর ও বোয়ালী ইউনিয়নের সীমানা বরাবর ঢোলসমুদ্র গ্রামের উত্তর প্রান্তে এবং উপজেলা সদর থেকে ১৪ কিমি উত্তর-পূর্বে মঠেরচালা প্রত্নস্থলটি অবস্থিত। চাপাইর ইউনিয়নের বড়ইবাড়ি মৌজায় এ প্রত্নস্থলের অধিকাংশ স্থান পড়লেও পূর্ব দিকের কিছু অংশ বোয়ালী ইউনিয়নের ডাকুরাই মৌজায় পড়েছে। প্রত্নস্থলটি ২৪°১২৩´ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ৯০° ২৬৫´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।

১.২ নামকরণ

এ প্রত্নস্থলটি স্থানীয়ভাবে 'মঠেরচালা' নামে পরিচিত। দুইটি টিলা ও তার মাঝের নিচু ভূমিকে বলা হয় বাঈদ এবং টিলা বা উঁচু ভূমির উপরিভাগের সমতল ভূমিকে বলা হয় চালা। নামকরণ থেকেই অনুমেয় হয় যে, এ চালাটিতে মঠ বা মঠজাতীয় স্থাপনা ছিল যা থেকে চালাটির নাম 'মঠেরচালা' হয়েছে।

১.৩ সংরক্ষিত পুরাকীর্তি ঘোষণা

মঠেরচালা প্রত্নস্থলটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক **২০০১ খ্রিস্টাব্দে** সংরক্ষিত পুরাকীর্তি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

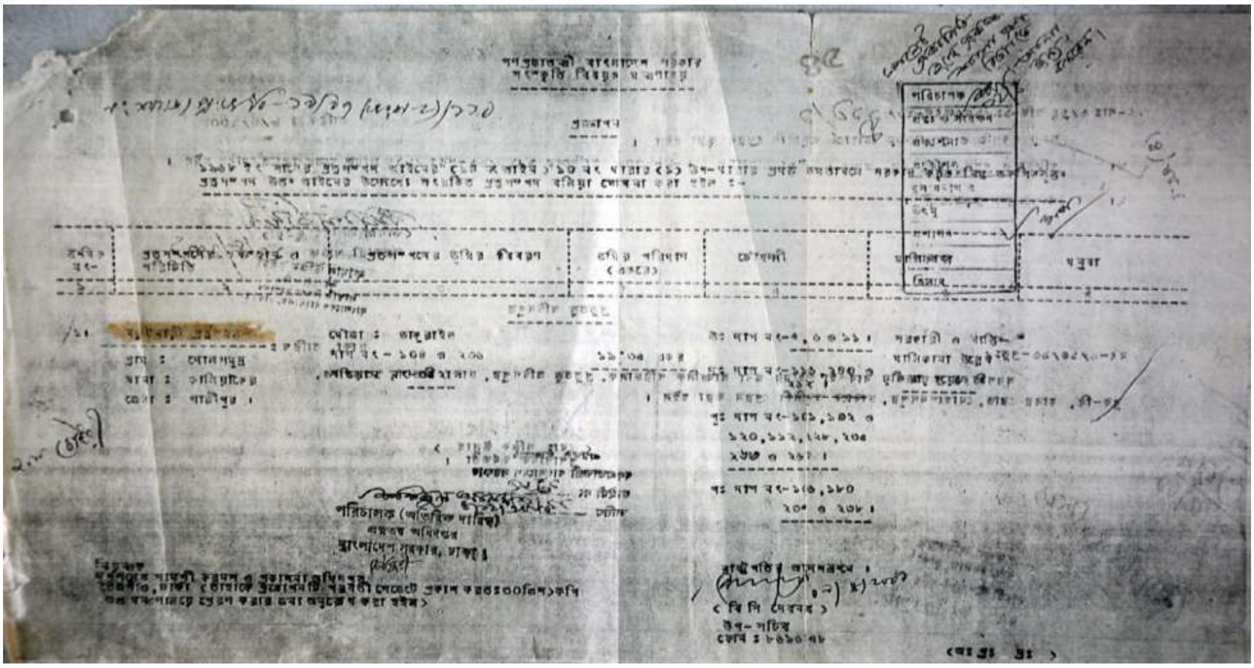

সংরক্ষিত পুরাকীর্তি ঘোষণার গেজেট

১.৪ মঠেরচালা এবং এর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ

'মঠেরচালা' এলাকার ভূমি প্লাইস্টোসিন যুগে গঠিত যা ভূতাত্ত্বিকভাবে মধুপুর ও ভাওয়াল গড়ের অন্তর্ভুক্ত। এ ভূমি সমুদ্র সমতল হতে প্রায় ৩০ মিটার উঁচু। এ স্থানকে স্থানীয় লোকজন পাহাড়ি এলাকা বলে থাকে। লাল মাটির এই পাহাড়ি এলাকা গভীর বনে আচ্ছাদিত। 'মঠেরচালা' প্রত্নস্থল থেকে ১ কিলোমিটার দক্ষিণে প্রবাহিত হচ্ছে তুরাগ নদী। প্রত্নস্থলটির দক্ষিণ-পূর্বে মকশ বিল, পূর্বে উজান বিল, পশ্চিমে পশ্চিম বাঈদ বিল এবং উত্তরে উঁচু ভূমি দ্বারা বেষ্টিত। মঠেরচালা প্রত্নস্থলের ৩০০ মিটার দক্ষিণে বিশাল আয়তনের ঢোলসমুদ্র দিঘি, ১০০ মিটার পূর্বে মধ্যপুকুর ও সন্নিকটে মিঠাপুকুর নামক তিনটি প্রাচীন জলাশয় রয়েছে।

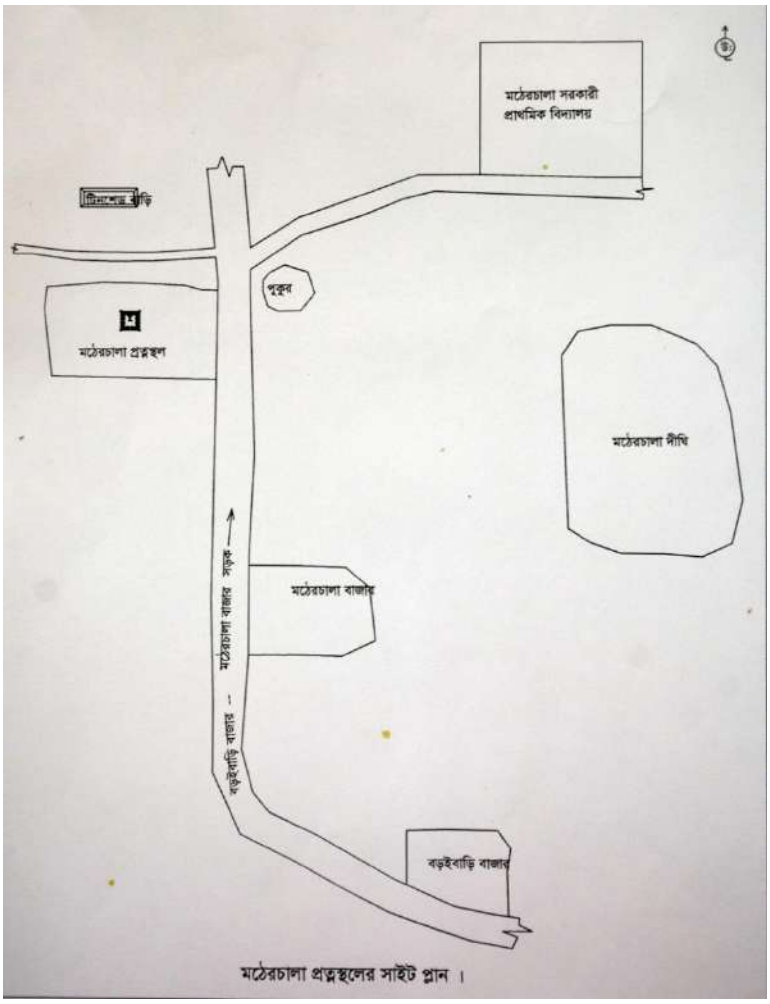

মঠেরচালার সাইট প্লান

আলোকচিত্র ০১: মঠেরচালার অবস্থান

আলোকচিত্র ০২: ঢোল সমুদ্র দিঘি **আলোকচিত্র ০৩: মধ্যপুকুর**

আলোকচিত্র ০৪: মকশ বিল **আলোকচিত্র ০৫: মিঠাপুকুর**

১.৫ গাজীপুর জেলা

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার উত্তর দিকে সংলগ্ন জেলাটি হচ্ছে গাজীপুর জেলা। এ জেলাটির আয়তন ১৭৪১.৫৩ বর্গ কিলোমিটার এবং এর মধ্যে বনভূমি ২৭৩.৪২ বর্গ কিলোমিটার। এর উত্তরে ময়মনসিংহ এবং কিশোরগঞ্জ জেলা, দক্ষিণে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ এবং নরসিংদী জেলা, পূর্বে নরসিংদী আর পশ্চিমে ঢাকা ও টাঙ্গাইল জেলা অবস্থিত। জেলাটি ২৩°৫৩′ হতে ২৪° ২০′ উত্তর অক্ষাংশ ও ৯০°০৯ হতে ৯০°৪১ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। লবলং, ব্রহ্মপুত্র, পারুলী, সুতী, গোয়ালী, শীতলক্ষা, বানার, তুরাগ, বালু, চিলাই হলো জেলার উল্লেখযোগ্য নদী।

আলোকচিত্র ০৬: গাজীপুর জেলার অবস্থান

১.৬ ঐতিহাসিক পটভূমি

আজকের বাংলাদেশ প্রাচীন যুগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক হতে খ্রিস্টীয় বারো শতক পর্যন্ত বিভিন্ন রাজবংশ (মৌর্য, গুপ্ত, খড়গ, পাল, দেব, চন্দ্র, রাত, সেন প্রভৃতি) বাংলা অঞ্চল শাসন করে। পরবর্তীতে তের শতক হতে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এ অঞ্চল মুসলিম ও ব্রিটিশ শাসনাধীনে ছিল।

প্রাচীন যুগে বাংলা নামে কোন অখণ্ড রাষ্ট্র ছিল না। এর বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। বাংলা অঞ্চল প্রায় ১৬টি জনপদে বিভক্ত ছিল। প্রাচীন বাংলার গুরুত্বপূর্ণ জনপদগুলো হলো-বঙ্গ, পুন্ড্র, বরেন্দ্র, সমতট, হরিকেল, রাঢ়, গৌড় প্রভৃতি। বিভিন্ন সময়ে এসব জনপদের সীমানার হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটায় এ সকল জনপদের সীমানা নিয়ে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, বৃহত্তর বগুড়া, রাজশাহী, রংপুর ও দিনাজপুর জেলার অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত ছিল পুণ্ড্র জনপদ, বগুড়া, পাবনা, রাজশাহী বিভাগের উত্তর পশ্চিমাংশ, রংপুর ও দিনাজপুরের কিছু অংশ নিয়ে বরেন্দ্র জনপদ, ঢাকা, ফরিদপুর, বিক্রমপুর, বাকলা (বরিশাল) নিয়ে বঙ্গ জনপদ, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ নিয়ে গৌড় জনপদ, বৃহত্তর কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চল নিয়ে সমতট জনপদ, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম,ত্রিপুরা, সিলেট নিয়ে হরিকেল জনপদ, পশ্চিম বাংলার দক্ষিণাঞ্চল বর্ধমান জেলা নিয়ে রাঢ় জনপদ গঠিত ছিল। সুলতানি আমলে সর্বপ্রথম এ সকল জনপদ একত্রে বাংলা বা বাঙ্গালা নামে পরিচিতি লাভ করে। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে আবুল ফজল বাংলা অঞ্চলের প্রাচীন নাম 'বঙ্গ' বলে উল্লেখ করেন। এছাড়া প্রাচীন গ্রন্থ ঐতরেয় আরণ্যকে 'বঙ্গ' একটি জাতি এবং দেশের নাম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বঙ্গ নামের এই প্রাচীন জনপদ বর্তমানের দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ নিয়ে গঠিত ছিল। ঢাকা, গাজীপুর, ফরিদপুর, বিক্রমপুর, বাকলা (বরিশাল) বঙ্গ জনপদের অংশ ছিল।

ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে গৌরবোজ্জ্বল ভাওয়াল জনপদ বা ভাওয়াল গড়ই আজকের গাজীপুর জেলা। প্রাচীন আমলের ডবাক, ডাকুরাইল, দাস, চণ্ডাল ও চেদী রাজ্যের মধ্যেই ছিল বর্তমান গাজীপুর। যশোপাল, শিশুপাল, প্রতাপপাল ও মহেন্দ্রপাল প্রভৃতি শাসক ভাওয়ালের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলো শাসন করতেন। এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোকে চেদী রাজ্য বলা হতো। মুসলিম আমলে এ এলাকাকে বলা হতো কুহিস্থান (পার্বত্য প্রদেশ), ভাওয়াল পরগণা, ভাওয়াল বাজুহা ও ভাওয়াল গড়। ব্রিটিশ আমলে এ এলাকা শুধু ভাওয়াল গড় নামেই পরিচিত ছিল।

বারো শতকে সেন রাজত্ব দুর্বল হয়ে পড়ে। ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী সেন বংশীয় শেষ রাজা লক্ষণ সেনকে ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে বিনা বাধায় পরাজিত করেন। ফলে ভাওয়ালসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিম শক্তির উত্থান ঘটে। শেরশাহের আমলে ভাওয়াল গাজী এ অঞ্চলের জমিদারি লাভ করেন। তিনি ছোট ছোট চেদী রাজ্যগুলো জয় করেন এবং নিজের নামে নাম রাখেন 'ভাহওয়াল' বা 'ভাওয়াল'। ভাওয়াল গাজী যখন জমিদারি লাভ করেছিলেন শেরশাহ তখন 'ভাওয়াল' গাজীর নামে এ অঞ্চলের নামকরণ করেন 'ভাওয়াল পরগনা'। পাহলোয়ান খাঁ গাজীর অন্যতম উত্তর পুরুষ হলেন শাসক ভাওয়াল গাজী। ১৯৪৬ খ্রি.পর্যন্ত ভাওয়াল পরগনা স্থায়ী ছিল। মোটামুটিভাবে ১৪০০ খ্রিস্টাব্দ হতে প্রায় ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, ভাওয়াল অঞ্চলে জমিদারি শাসনে সর্বশেষ ভূমিকা রেখেছেন পাহলোয়ান খাঁ গাজী, কাইয়ুম খাঁ গাজী, তিলা গাজীদের বংশধরগণ। এই গাজী শাসকরাই খণ্ডকালীন স্বাধীন ভাওয়াল ইতিহাসের অমর কুশীলব। ১৬শ শতাব্দী হতে ১৮শ শতাব্দী পর্যন্ত গাজী বংশ ভাওয়াল শাসন করেন।

১.৭ ভূ-প্রকৃতি

লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্রের শাখা-প্রশাখা, প্রাচীন নদী লবলং ছাড়াও শীতলক্ষ্যা, বানার, তুরাগ, বংশী, বালু ও চিলাই ইত্যাদি নদ-নদী ভাওয়াল এলাকার উপর দিয়ে প্রবাহিত। ভাওয়াল এলাকার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাংশের গড় উচ্চতা সমুদ্র সমতল হতে ৬ মিটার এবং পশ্চিম দিকে টিলা এলাকার গড় উচ্চতা প্রায় ৩০ মিটার। এ অঞ্চলের ভূমি পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে ঢালবিশিষ্ট এবং ব্রহ্মপুত্র প্লাবন ভূমির দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবনমিত সোপান দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত। ভাওয়াল এলাকার টিলা সদৃশ উঁচু ভূমিকে বলে টিলা বা টেক।

অপেক্ষাকৃত মধ্যম কিন্তু সমতল ভূমিকে বলে চালাভূমি। দুটি টিলা বা টেক এবং চালা ভূমির মাঝে অপেক্ষাকৃত নিচু ভূমিকে বলে বাঈদ যা পাহাড়ি এলাকার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ফসল উৎপাদনকারী উর্বর ভূমি। নিচু জায়গাকে বলে নালজমি। নিচু গভীর জমিকে বলে ডোবা, যার মাটির রং কালো। উত্তরের বনভূমির মধ্যবর্তী এলাকার উত্তর-দক্ষিণ বরাবর শিরার ন্যায় একটি উঁচু ভূমি বিদ্যমান যা তুরাগ ও বানার নদীর জল প্রবাহের বিভাজক হিসেবে কাজ করে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে বনভূমির গড় উচ্চতা ১৮ মিটার। বনভূমির কিছু কিছু এলাকার উচ্চতা আবার ৫০ মিটারের অধিক। অধিক উচ্চতর ভূমিকে স্থানীয়ভাবে বলা হয় পাহাইড়া এলাকা।

পাহাড়ি এলাকা বলতে মূলত ভাওয়াল অঞ্চলের বর্তমান গাজীপুর জেলার পশ্চিম অংশে কালিয়াকৈর ও শ্রীপুরে যে সকল উঁচু ভূমি দেখা যায় সেগুলোকে বোঝানো হয়ে থাকে। এ পাহাড়ি অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে সালদহ, গোয়ালী, তুরাগ প্রভৃতি স্রোতধারা প্রবাহিত হয়েছে।

১.৮ উদ্ভিজ্জ

প্রাকৃতিক বনে গজারি, বহেড়া, কুম্ভী, জলপাই, কড়ই, সোনালু, দাতই, তিতিজাম, বনসাই, চাল্লাগুটি, কারজলি, কোলকাটা, মোনকাটা, হাতিশুড় ঢোলকলস প্রভৃতি গাছ জন্মে। যেখানেই বসতি গড়ে উঠেছে সেখানেই কাঁঠাল, আম, তেঁতুল, বরই ইত্যাদি গাছ দেখা যায়।

১.৯ নৃ-তত্ত্ব ও জনগোষ্ঠী

আর্যরা ভারত আক্রমণ করলে দ্রাবিড় জাতি ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সরে এসে বসতি স্থাপন করে। অপরপক্ষে মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠী প্রাচীন বাংলার উত্তর-পূর্ব দিক দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে এবং পূর্বে চট্টগ্রাম ও সিলেট থেকে উত্তরে গারো পাহাড় অবধি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। বর্তমানেও গাজীপুরের পূর্বে মিশ্র সংকর প্রকৃতির মানুষ এবং উত্তরে অটুট গারোদের নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু হিসেবে বসবাস করতে দেখা যায়। আর জেলার পশ্চিম অংশে বাস করতো রাজবংশী ও দ্রাবিড় জাতির বিভিন্ন টোটেমের কৃষ্ণকায় মানুষেরা। বর্তমানেও গাজীপুরের মানবগোষ্ঠীকে জাতিতাত্ত্বিক নিরীখে বিশ্লেষণ করলে বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক জৈব বৈশিষ্ট্যের মানব বংশগতি লক্ষ করা যায়। যেমন-চন্ডাল, নিষাদ, গারো, কোচ, রাজবংশী, নুনিয়া, ভাড়গড়, সাঁওতাল, ওরাওঁ, মণিপুরি, মান্দি, চেদী প্রভৃতি। ভাওয়াল অঞ্চলে পূর্বে হিন্দুদের প্রাধান্য থাকলেও বর্তমানে মুসলমান সংখ্যায় প্রাধান্য লাভ করেছে। আদিবাসী গোষ্ঠীগুলোর কিছু পরিবার খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে।

আলোকচিত্র ০৭: আদিবাসী

আলোকচিত্র ০৮: আদিবাসী

অধ্যায় ০২:

প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও পর্যালোচনা (২০১৩-২০১৪ অর্থবছর)

মোছাঃ নাহিদ সুলতানা

বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চলে ঢাকা বিভাগের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ভাওয়াল পরগণার গহীন বনাঞ্চল ও রক্ত মৃত্তিকার দৃষ্টিনন্দন ঐতিহাসিক স্থানে এই গাজীপুর জেলা অবস্থিত। মুঘল, বৃটিশ ও পাকিস্তান শাসনামলে বিভিন্ন আন্দোলন ও সংগ্রামে গাজীপুরের রয়েছে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা। এ জেলার উত্তরে রয়েছে ময়মনসিংহ ও কিশোরগঞ্জ জেলা, দক্ষিণে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদী জেলা, পূর্বে নরসিংদী জেলা এবং পশ্চিমে টাঙ্গাইল জেলা। প্রাচীন নিদর্শন ও প্রত্নসম্পদের মধ্যে ঢোলসমুদ্র মঠেরচালা, টোক বাদশাহী মসজিদ, চৌরা দিঘী ও মাজার, মীর জুমলার টঙ্গী পুল, ভাওয়াল রাজবাড়িসহ উল্লেখযোগ্য বেশকিছু প্রত্নস্থল এ জেলার প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য বহন করছে।

গাজীপুর জেলার মানচিত্র

কালিয়াকৈর উপজেলার মানচিত্র

ঢোলসমুদ্র মঠের চালা প্রত্নস্থলটি গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলা সদর থেকে ১৪ কিমি উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত। কালিয়াকৈর উপজেলার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত তুরাগ নদীটি একসময় বর্ণিত প্রত্নস্থলের খুব নিকট দিয়ে প্রবাহিত হতো। বর্তমানে নদী কিছুদূর সরে যাওয়ায় প্রত্নস্থলটির চারিপাশে বেশ কিছু বিল এর নাম পাওয়া যায় এবং বর্তমানে বিলগুলো এ প্রত্নস্থলের চারদিক ঘিরে রয়েছে, যেমন: মকশ বিল, গজারিয়া বিল, আলুয়া বিল ইত্যাদি। এছাড়াও মঠেরচালা প্রত্নস্থলের সাথে জড়িয়ে আছে ঢোলসমুদ্র নামটি। মূলত ঢোলসমুদ্র নামক বিশাল দিঘীটি প্রত্নস্থলের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত এবং প্রাচীন এ দিঘীটি উত্তর-দক্ষিণে প্রলম্বিত। এ অঞ্চলের মাটির গঠনে কিছুটা বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় এবং এ অঞ্চলের ভূমি পাহাড়ী ও পরিখা সদৃশ ভূমির সমন্বয়ে গঠিত। কোন কোন স্থানের ভূমি সমতল থেকে ৪/৫ মিটার পর্যন্ত উঁচুতে অবস্থিত। আবার এর নিচেই রয়েছে পরিখা সদৃশ নীচু ভূমি। বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এই উঁচু ভূমিগুলোকে বলা হয় 'চল্লা' বা 'চালা' এবং পরিখা সদৃশ ভূমিগুলোকে বলা হয় 'বাইদ'। ঢোলসমুদ্র মঠেরচালা প্রত্নস্থলটিও এমনই একটি চল্লা বা চালার উপরে অবস্থিত এবং উৎখননকৃত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনটিকে স্থানীয়ভাবে বলা হচ্ছে মঠ বা কোন মন্দির বা উপাসনালয়। এ কারণেই স্থানীয়ভাবে এ স্থানটির নাম "মঠেরচালা"। এ প্রত্নস্থল সংলগ্ন উত্তর দিকে প্রাচীন মিঠা পুকুর, পূর্ব দিকে কোদাল ধোয়া দীঘি এবং দক্ষিণ দিকে প্রাচীন দীঘি ঢোলসমুদ্র অবস্থিত।

৪.৮ কাঁচের গুটিকা (MCH.2015.48)

কোয়ার্টজ পাথরের তৈরি সাদা রঙের গুটিকা। হেক্সাগোনাল গুটিকাটি অপটু হাতে তৈরি। প্রতিটি কোনা ও তল অসমান এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ। গুটিকাটি ১.৪৫ সেমি লম্বা।

৪.৯ পোড়ামাটির তৈরি প্রত্নবস্তু

১) প্রদীপ স্ট্যান্ড (MCH.2015.24)

পোড়ামাটির তৈরি প্রদীপ স্ট্যান্ডের নিচের অংশ যা নিরেট এবং ভারী। স্ট্যান্ডটির উচ্চতা ১০ সেমি এবং যে তলে স্ট্যান্ডটি দাঁড় করানো হতো সেদিক সমতল ও উপরের দিকে চারকোনা একটি ছিদ্র রয়েছে। এই ছিদ্রে কাঠ বা বাঁশের কাঠি থাকতো যার উপর তৈল প্রদীপ রাখা হতো। বোতল আকৃতির স্ট্যান্ডের গলায় ভাঁজ রয়েছে। ১০ সেমি উচ্চতাবিশিষ্ট স্ট্যান্ডটির নিচের অংশের ব্যাস ৬.৪ সেমি ও উপরের অংশের ব্যাস ৫.৯ সেমি।

২) পোড়ামাটির শিবলিঙ্গ (MCH.2015.49)

পোড়ামাটির তৈরি শিবলিঙ্গ। দুইখণ্ডে ভাঙা অবস্থায় লিঙ্গটি পাওয়া গেছে। লিঙ্গটি ১০ সেমি লম্বা এবং এর ব্যাস ৪.২ সেমি। এ ধরনের শিবলিঙ্গ মহাস্থানে পাওয়া গেছে যা মহাস্থান জাদুঘরে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

৩) পোড়ামাটির বল (MCH.2015.40)

লালচে রঙের পোড়ামাটির গোলাকার বল। বলের একদিক সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত। বলের ব্যাস ২.৭ সেমি।

অধ্যায় ০৫:

উৎখনন ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত সেমিনার

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে ১০ এপ্রিল ২০১৫ খ্রি. তারিখে ঢোলসমুদ্র গ্রামের মঠেরচালা প্রত্নস্থলে "প্রত্নতাত্ত্বিক খনন, সংরক্ষণ ও স্থানীয় জনসাধারণের সম্পৃক্ততা" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে মঠেরচালা প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও ফলাফলের উপর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা আঞ্চলিক কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ মাহাবুব-উল আলম।

সেমিনারে আগত গবেষক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মতামত:

❖ অধ্যাপক ড. শরিফ উদ্দিন আহমেদ, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়:

দেশের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ড. শরিফ উদ্দিন আহমেদ ইতিহাসকে জানার এই অনন্য প্রয়াসকে স্বাগত জানান। তিনি মনে করেন যে, মঠেরচালা উৎখনন ফলাফল দেশের ইতিহাসে নতুন মাত্রা যোগ করবে।

❖ জনাব মোঃ সোহরাব উদ্দিন, প্রভাষক ও সভাপতি, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়:

প্রত্নস্থানে স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততার লক্ষ্যে সেমিনার আয়োজনকে অত্যন্ত শুভ উদ্যোগ হিসেবে বর্ণনা করে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সভাপতি বলেন যে, প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুসমূহের সাথে স্থাপত্য কাঠামো ও সময়কালের কোনো পার্থক্য রয়েছে কি না এই বিষয়ে গবেষণা প্রয়োজন।

❖ অধ্যাপক ড. মোঃ মোকাম্মেল হোসেন ভুঁইয়া, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়:

অধ্যাপক ড. মোঃ মোকাম্মেল হোসেন ভুঁইয়া বলেন যে, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের কাজের সাথে তিনি ও তাঁর বিভাগ সবসময় সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। কালিয়াকৈর থেকে একটি 'তারা মূর্তি' পাওয়া গিয়েছিল যা এই অঞ্চলের প্রাচীনত্বকে প্রমাণ করে। উৎখননে উন্মোচিত স্থাপত্য কাঠামোটির চারকোণের স্থাপত্যিক অলংকরণকে "কর্নার টারেট" বলা হয় তা পিলাস্টারও হতে পারে বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।

❖ ড. রণজিৎ কুমার বিশ্বাস, সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়:

বিশেষ অতিথির বক্তব্য উপস্থাপনকালে সচিব মহোদয় সকল স্থানীয় সুধীকে অভিনন্দন জানান তাদের এই সাড়া দানের জন্য। তিনি বলেন যে, প্রত্নস্থল সংরক্ষণ করতে হবে। আমরা এখনও প্রত্নচর্চাকে অপচয় মনে করি, যা ঐতিহ্য রক্ষার জন্য সহায়ক নয়। শিক্ষিত ও রুচিশীল মানুষ রাষ্ট্র ক্ষমতায় আছে বলেই বর্তমানে প্রত্নচর্চার ক্ষেত্র অতীতের যে কোনো মুহূর্তের চাইতে অধিক উৎসাহব্যঞ্জক বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

❖ বেগম সিমিন হোসেন রিমি, এমপি ও সভাপতি, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটি:

প্রধান অতিথি ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটির সভাপতি বেগম সিমিন হোসেন রিমি, এমপি বলেন যে, এই অঞ্চলকে আমি প্রত্নতত্ত্বের খনিই বলব। এর উন্নয়ন ও সুরক্ষায় আমি আমার যথাসাধ্য অবদান রাখার চেষ্টা করব। এই কাজে স্ব-উদ্যোগে সম্পৃক্ত সকলকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে নদী দিয়ে অতীত মানুষের যোগাযোগব্যবস্থা, বাণিজ্য, প্রযুক্তি, মুদ্রা বিনিময়, চিন্তার বিকাশ, জনপদ গড়ে ওঠার ইতিহাস, নদী ভাঙ্গনের কারণ প্রভৃতি নানা বিষয়ে আমরা জানতে পারি। আমরা জানি অতীত গৌরব মসলিনের কথা। এই মসলিন কাপড়ের উৎপত্তিস্থল ছিল ঢাকার অদূরে অবস্থিত নরসিংদী ও কাপাসিয়া। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সুরক্ষায়

উপযুক্ত পরিবেশ, মানসিকতা ও সহযোগিতা প্রয়োজন। প্রাচীন ভাওয়াল নাটমন্দির যেখানে বর্তমানের গাজীপুর জেলা প্রশাসনিক কার্যালয়, তার স্থানান্তর পূর্বক নাটমন্দিরটিও সংরক্ষণ করা জরুরি। এই কাজে প্রয়োজন অর্থের সংস্থান। স্থানীয় জনগণ ইতিহাসের সঙ্গী হয়ে থাকবেন এই সুরক্ষা কার্যক্রমের অংশীদার হিসেবে। এইযে আমি কথা বলছি তা একটু পরেই অতীত হয়ে যাবে। যা কিছু ভালো তা আমাদের সবাইকে গ্রহণ করতে হবে। তিনি আরো বলেন যে, পর্যটন শিল্পের বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও সুষ্ঠু বিকাশে সহযোগিতা প্রদান করা হবে। প্রত্নতাত্ত্বিক অগ্রযাত্রাকে সমৃদ্ধকরণের মাধ্যমে মুক্তবুদ্ধির চর্চার ক্ষেত্রে সকলে মিলে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

- ❖ বেগম শিরিন আখতার, মহাপরিচালক(অতিরিক্ত সচিব), প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর,ঢাকা:

সভাপতির বক্তব্যে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বেগম শিরিন আখতার প্রথমেই সেমিনারে আগত প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ও সুধীবৃন্দকে সেমিনারে উপস্থিত হবার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন যে, সাধারণ জরিপ ও প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপের মধ্যে কার্যপদ্ধিতির ব্যবধান রয়েছে। প্রত্নস্থান ও প্রত্নবস্তু সন্ধানে পরিচালিত প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ একটি নিবিড় পর্যবেক্ষণ, ডকুমেন্টেশন ও পরিশ্রমসাধ্য কাজ। তিনি অধিদপ্তর ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মচারীদের এই কাজের সফল সমাপ্তির জন্য অভিনন্দন জানান। তিনি আরো বলেন যে, গত দুই অর্থবছরের ধারাবাহিক প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলাফল এই সেমিনারে উপস্থিত হলো যা প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে আমি আশা ব্যক্ত করি।

- ❖ ড. শফিকুল আলম, সাবেক মহাপরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর:

আলোচনায় অংশ নিয়ে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক ড. শফিকুল আলম উৎখনন দলকে এই সুশৃঙ্খল কাজের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, ২০১৩-২০১৪ অর্থবছর থেকে এই কাজ পরিদর্শন ও নির্দেশনার কাজে আমি কিছুটা সম্পৃক্ত ছিলাম। প্রথম দিকে এই প্রত্নস্থলের স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য দেখে একে সুলতানি আমলের মনে হলেও বেদি ও শিবলিঙ্গের প্রাপ্তির পর উৎখনন দলের সাথে আমিও একে মন্দির স্থাপত্যের নিদর্শন বলে অনুমান করছি। নব্যপ্রস্তর যুগীয় হাতিয়ারের আবিষ্কার এই প্রত্নস্থল সম্পর্কে গবেষণাকে ভিন্নমাত্রা প্রদান করবে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

সেমিনারের আলোকচিত্র

সেমিনার
"ঢোলসমুদ্র প্রত্নস্থল: উৎখনন ও সংরক্ষণে স্থানীয় জনসাধারণের
প্রধান অতিথি : জনাব আ.ক.ম মোজাম্মেল হক এম.পি, মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বিশেষ অতিথি
সভাপতি
বিশেষ অতিথি
প্রধান অতিথি
বিশেষ অতিথি

সেমিনার
"ঢোলসমুদ্র প্রত্নস্থল: উৎখনন ও সংরক্ষণে স্থানীয় জনসাধারণের সম্পৃক্ততা"

অধ্যায় ০৬:
উপসংহার: একটি সার্বিক পর্যালোচনা

মোঃ মাহবুব-উল আলম

স্থাপত্যিক কাঠামো, নির্মাণ উপকরণ, দেয়ালের পুরুত্ব, অনাবৃত দেয়াল, ব্যবহিত ইটের আকার ও আয়তন, অলংকৃত ইট প্রভৃতি নমুনাগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে মঠেরচালা প্রত্নস্থল উৎখননে উন্মোচিত প্রাচীন স্থাপনাটিকে আপাতদৃষ্টিতে

চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে নির্মিত মুসলিম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কোন স্থাপত্য কাঠামো বলেই মনে হয়। স্থাপত্য কাঠামো নির্মাণে ব্যবহৃত বর্গাকৃতি ইটের আকার আকৃতির ভিত্তিতে স্থাপনাটি রাজশাহীর বাঘা মসজিদ এবং নওগাঁ জেলার কুসুম্বা মসজিদ, অলংকৃত ইট ব্যবহারের দিক থেকে রোয়াইলবাড়ি প্রত্নস্থল, স্থাপত্য কাঠামোতে ব্যবহৃত কর্নারটারেটের ভিত্তিতে নারায়ণগঞ্জের বন্দরশাহী মসজিদ, টাঙ্গাইলের আতিয়া মসজিদ, ঘোরাঘাটের সুরা মসজিদ, রাজশাহীর বাঘা মসজিদ, নওগাঁর কুসুম্বা মসজিদ এবং অভ্যন্তরীণ ভবনের পিলাস্টার ব্যবহারের ক্ষেত্রে টাঙ্গাইলের আতিয়া মসজিদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বলে মনে হয় ।এছাড়া এখানে উৎখননে চকচকে মসৃণ গ্লেজড মৃৎপাত্রের টুকরা পাওয়া যায়। এ ধরনের চকচকে মসৃণ গ্লেজড মৃৎপাত্রের টুকরা বাগেরহাটের খান জাহানের বসতভিটা এবং মহাস্থান প্রত্নতাত্ত্বিক খননে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, যা সুলতানী আমলে ব্যবহৃত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। তবে, মঠেরচালা প্রত্নস্থলে উন্মোচিত বর্গাকার স্থাপত্যিক কাঠামোর ধ্বংসাবশেষ মুসলিম স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বলে মনে হলেও মসজিদ বা মাজার হিসেবে ব্যবহারের কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। সাধারণত মাজার বা মসজিদের সন্নিকটে ওজু করে নামাজ পড়ার জন্য দীঘি কিংবা পুকুর খননের লোকজ ধর্মীয় প্রথার অংশ হিসেবে দীঘি বা জলাশয়ের উপস্থিতি থাকলেও এক্ষেত্রে দীঘির অস্তিত্ব দেখা যায় মূল স্থাপনা থেকে পূর্বদিকে বেশ খানিকটা দূরে। দীঘিটির সাথে প্রাচীন স্থাপনার ঐতিহাসিক সম্পর্ক থাকার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। যা মন্দিরে আগত পুণ্যার্থীদের স্নানের কাজে ব্যবহারের ইঙ্গিত বহন করে। 'মঠ' শব্দটি মূলত হিন্দু ও বৌদ্ধ স্থাপনার সঙ্গেই সম্পৃক্ত। সাধারণত শিখরবিশিষ্ট উঁচু হিন্দু মন্দিরকেই 'মঠ' বলা হয়ে থাকে। মঠেরচালার ধ্বংসাবশেষকে কেউ কেউ বৌদ্ধ চৈত্যের একটি স্মারক হিসেবে ধারণা করলেও তাদের এরূপ বক্তব্যের সপক্ষে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। স্থানীয় জনশ্রুতির ভিত্তিতে মঠেরচালা প্রত্নস্থলটিকে অনেকেই রাজা যশোপালের বাড়ি হিসেবে আখ্যায়িত করলেও খননে কোন রাজবাড়ি কিংবা সাধারণ কোনো বাড়ির আলামত পাওয়া যায়নি। হিন্দু মন্দিরের সপক্ষে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নসাক্ষ্য হচ্ছে মহাস্থানে পাওয়া পোড়ামাটির তৈরি শিবলিঙ্গের অনুরূপ প্রত্নবস্তু প্রাপ্তির ঘটনা এবং উন্মোচিত কাঠামোটির অভ্যন্তরে পরিকল্পিতভাবে অনুচ্চ মেঝে বা বেদি নির্মাণ করে এর উপরে একটি কালো পাথর স্থাপনসহ এর সম্মুখে একটি গোলাকার পাথর স্থাপন করা হয়েছে যা পূর্ব দিকের দরজা বরাবর একেবারে মধ্যবর্তী স্থানের মূল বিন্দুতে (Cardinal point) অবস্থিত। এই ধরণের সজ্জা সাধারণত হিন্দু মন্দির (বিশেষত শৈব-শাক্তমন্দির) স্থাপত্য কলায় পাওয়া যায়। কালো পাথরের মাঝখানে ১০ সেমি গভীর গর্তটি মূলত কোন বিগ্রহ দেবতা স্থাপনের বিষয়টিকে প্রমাণ করে। গোলাকার বেলে পাথরটির দুটি অগভীর ছিদ্র ও একপ্রান্তে বর্গাকার ছিদ্র থেকে গবেষকদের বদ্ধমূল ধারণা এখানে সম্ভবত কোন নন্দী মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল। মূর্তি বা শিবলিঙ্গ স্থাপনের জন্য পাথরের তৈরি বেদির উপস্থিতি ও মহাস্থানে পাওয়া পোড়ামাটির তৈরি শিবলিঙ্গের অনুরূপ প্রত্নবস্তু প্রাপ্তির ঘটনা আদি ঐতিহাসিক কালপর্বের সুস্পষ্ট আলামত প্রকাশ করে। পোড়ামাটির শিবলিঙ্গ প্রাপ্তির ঘটনা নিঃসন্দেহে প্রত্নস্থলে প্রাচীন শিব মন্দিরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

মঠেরচালা প্রত্নস্থলে আবিষ্কৃত প্রাচীন মন্দির কে বা কারা নির্মাণ করেছিল বা কখন নির্মিত হয়েছিল তার কোনো লিখিত বা প্রামাণ্য উপাদান না থাকা সত্বেও প্রাপ্ত প্রত্নবস্তু ও নিদর্শনের উপর ভিত্তি করে একটি সম্ভাব্য কালপর্ব নির্ধারণ করা সম্ভব হলেও এ বিষয়ে চূড়ান্ত মন্তব্য করা যুক্তিসংগত হবে না। তবে পরোক্ষভাবে স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য, স্তরতাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ, বিভিন্ন বসতিস্তর থেকে প্রাপ্ত মুসলিম গ্লেজ্‌ড ওয়্যার বিশ্লেষণ, আলংকারিক ইটের পরিমাপ, চুনবালির পলেস্তারা ব্যবহার, মূর্তি বা শিবলিঙ্গ স্থাপনের জন্য পাথরের তৈরি বেদির উপস্থিতি ও মহাস্থানে পাওয়া পোড়ামাটির তৈরি শিবলিঙ্গের ন্যায় অনুরূপ প্রত্নবস্তু প্রাপ্তির আলামত থেকে উন্মোচিত স্থাপত্যিক কাঠামোটিকে আনুমানিক ষোল কিংবা সতের শতকে নির্মিত কোনো হিন্দু মন্দির সদৃশ স্থাপত্য নিদর্শন বলেই ধারণা করা যায়। উপরের স্তর-১ হতে ব্রিটিশ মুদ্রা প্রাপ্তির প্রত্নসূত্র, ব্রিটিশ আমলের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এ মন্দিরটি টিকে থাকার প্রমাণ দেয়। তাছাড়া উৎখননে নব্যপ্রস্তর যুগের পাথরের হাতকুঠার প্রাপ্তির পাথুরে প্রমাণ থেকে প্লাইস্টোসিন যুগে ভাওয়াল ভূমিতে নব্যপ্রস্তর যুগের মানব বসতির সম্ভাবনাকে আরও জোরদার করে। সর্বোপরি মঠেরচালা প্রত্নস্থলটি

বাংলাদেশের সমৃদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাসে নবতর অধ্যায় হিসেবে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ইতিহাস পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সাইটপ্লান

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের জাদুঘর পরিদর্শনের সময়সূচি

গ্রীষ্মকালীন সময়সূচি ঃ

১ এপ্রিল হতে ৩০ সেপ্টেম্বর

মঙ্গল থেকে শনিবার

সকাল ১০:০০টা - বিকাল ৬:০০টা

সোমবার দুপুর ২:০০টা - বিকাল ৬:০০টা

রবিবার সাপ্তাহিক বন্ধ

শীতকালীন সময়সূচি ঃ

১ অক্টোবর হতে ৩১ মার্চ

মঙ্গল থেকে শনিবার

সকাল ৯:০০টা - বিকাল ৫:০০টা

সোমবার দুপুর ১:৩০টা - বিকাল ৫:০০টা

রবিবার সাপ্তাহিক বন্ধ

আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

e-mail: rd_chittagong@archaeology.gov.bd
web: http://archaeology.comilla.gov.bd/

প্রকাশকাল: জুন ২০২২

শালবন বিহার

আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

শালবন বিহার

কেন্দ্রীয় মন্দির

তারা মন্দির

কুমিল্লা জেলার লালমাই-ময়নামতি অঞ্চলে অবস্থিত শালবন বিহার বাংলাদেশের প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম নিদর্শন। এ বৌদ্ধ বিহারটির অবস্থান কুমিল্লা শহর থেকে কোটবাড়ির আনুমানিক ১.৫ কিলোমিটার দক্ষিণ দিকে শালমানপুর গ্রামে।

'শালবন বিহার' নামে পরিচিত এ প্রত্নস্থলটিতে বিভিন্ন সময়ে পরিচালিত প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে বৌদ্ধ মন্দির ও বিহারের ধ্বংসাবশেষ উন্মোচিত হয়। শালবন বিহারের প্রকৃত নাম 'শ্রী ভবদেব মহাবিহার'। সাত থেকে আট শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত দেব বংশের শাসনকালে ৪র্থ রাজা শ্রী ভবদেব কর্তৃক এ মহাবিহারটি নির্মিত। বর্গাকার বিহারটির প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য ১৬৮ মিটার। বিহারটির চার বাহুতে সর্বমোট ১১৫টি সন্ন্যাস বা ভিক্ষুকক্ষ এবং মধ্যভাগে ১টি মন্দির রয়েছে। মধ্যভাগের মূল মন্দিরের চারপাশে ছোট ছোট আরও বেশ কিছু সংখ্যক মন্দির এবং স্তূপের ধ্বংসাবশেষ উন্মোচিত হয়েছে। এ বিহারের বিশেষ আকর্ষণ হল উত্তর বাহুর মধ্যবর্তী স্থানে

বৌদ্ধ মন্দির

উন্মোচিত বিশালাকার তোরণের ধ্বংসাবশেষ। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে শালবন বিহারে ৪টি স্তরে নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ এবং সংস্কার-মেরামত পর্যায়ের ধ্বংসাবশেষ উন্মোচিত হয়েছে।

স্তূপ

এর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন কেন্দ্রীয় মন্দিরটি হল ৩য় কালপর্যায়ে (৭ - ৮ শতকের) নির্মিত স্থাপনার ধ্বংসাবশেষ। তবে ২য় ও ১ম কালপর্যায়ের (৭ শতকের আগের) প্রত্ন-স্থাপত্যিক কাঠামোর কোনো ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পাওয়া যায়নি। এখানে, ৩য় কালপর্যায়ের উপরে ৪র্থ ও ৫ম কালপর্যায়ে (৯ - ১০ শতকের) মেঝে এবং প্রবেশপথের ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পাওয়া যায়। বিহারের কক্ষগুলোর অভ্যন্তরে ২টি বিশেষ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়েছে। এগুলো হলঃ অলংকৃত ইটের পাদস্তম্ভসহ কক্ষে পরিকল্পিতভাবে আগুন জ্বালানোর উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা।

এ বিহারের উল্লেখযোগ্য অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসমূহ দরবার আঙ্গিনার সোপান, কোণের কক্ষগুলিতে সিঁড়ি, কেন্দ্রীয় কক্ষগুলির প্রতিটি কক্ষে দেবদেবীর মূর্তি এবং কুলুঙ্গি। শালবন বিহার ৭ - ৮ শতকে বাংলার বৌদ্ধ মন্দির

পাতকুয়া

স্থাপত্যের এক পরিপূর্ণ বিকাশের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। শালবন বিহারের কেন্দ্রীয় মন্দিরটি প্রকৃতপক্ষে কোনো একক স্থাপত্যিক কাঠামো নয়। এখানে বিভিন্ন সময়ের ৬টি নির্মাণ কাঠামোর অস্তিত্ব রয়েছে। এ কাঠামোগুলো বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পরিকল্পনায় একই স্থানে একের পর এক নির্মাণ করা হয়। পরবর্তী দুই কালপর্যায়ে (৪র্থ এবং ৫ম কালপর্যায়ে) শালবন বিহারের কেন্দ্রীয় মন্দিরটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। এ কালপর্যায়ে মন্দিরটি ক্রুশাকৃতির পরিবর্তে আয়তাকার হয়ে উঠে। এভাবে পুরোপুরি খোলা, সুপরিসর ও কার্যোপযোগী হয়ে উঠায় গোটা মন্দির কাঠামোটি প্রায় হিন্দু মন্দির স্থাপত্যে রূপ পরিগ্রহ করে।

নীলপদ্ম
পোড়ামাটির ফলক

জাতিসংঘের সদর দপ্তরে ১৯৯৯ সাল হতে বাংলাদেশ সরকারের উপহার হিসাবে প্রদর্শিত রয়েছে। ১৯৯৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ মহাসচিবকে পোড়ামাটির এ ফলকটি উপহার প্রদান করেন।

বৌদ্ধ পীঠস্থান বা মন্দিরের নিচতলার দেয়ালে পোড়ামাটির ইটের অলঙ্করণ একটা ঐতিহ্যগত রীতি। পীঠস্থানগুলোর প্রধান আকর্ষণ বহির্দেয়াল থেকে অভ্যন্তরের প্রকোষ্ঠ - যেখানে মূর্তি, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য অলঙ্করণ রয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে শালবন বিহারে আরও বহু প্রত্ন-স্থাপত্যিক কাঠামোর অস্তিত্ব উন্মোচিত হয়েছে।

এসব প্রত্ন-স্থাপত্যিক কাঠামোর মধ্যে রয়েছে ইঁদারা, পাকা মেঝে, ভোজনালয়, ছোট স্তম্ভ, পূজার স্তূপ এবং মন্দির। এগুলোর ভিত ও বুনিয়াদ খুবই সুন্দর। এছাড়া বিহারের বাইরে তারা মন্দির ও স্তূপসহ আরও প্রত্ন-স্থাপত্যিক কাঠামোর অস্তিত্ব উন্মোচিত হয়েছে।

ব্রোঞ্জ নির্মিত নিবেদন স্তূপ

স্বর্ণমুদ্রা

প্রত্নতাত্ত্বিক খননকালে এ প্রত্নস্থলে বিভিন্ন ধরনের পোড়ামাটির চিত্রফলক, মৃৎপাত্র, পোড়ামাটির গুটিকা, ব্রোঞ্জ ও মাটির মূর্তি, অলংকৃত ইট, তাম্রলিপি, সিলমোহর, স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রাসহ বিভিন্ন মূল্যবান প্রত্নবস্তু পাওয়া যায়।

এসব প্রত্নবস্তু ময়নামতি জাদুঘরে সংরক্ষিত ও প্রদর্শিত অবস্থায় রয়েছে। আর শালবন বিহারে আবিষ্কৃত প্রত্নসম্পদ ৭ থেকে ১২ শতকের প্রাচীন বঙ্গ ও সমতট জনপদের অতীত স্মৃতি বহন করছে।

রৌপ্যমুদ্রা